প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৭১

প্রকাশ করেছেন :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন :
আশিস চৌধুরী

ছেপেছেন :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।

TAKIYE DEKHI
By Serajul Islam Choudhury
MUKTADHARA
[Swadhin Bangla Sahitya Parishad]
74 Farashgonj
Dacca—1
Bangladesh

ফন্টু'কে

এই লেখকের অন্যান্য বই

অন্বেষণ/দ্বিতীয় ভুবন

নিরাশ্রয় গৃহী/এ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব

বুনো হাঁস/কাব্যের স্বভাব (অনুবাদ)

Introducing Nazrul Islam

ছোটদের শেক্সপীয়র

এই বইয়ের লেখাগুলো তখনকার 'দৈনিক পাকিস্তান' ও বেতারের পাক্ষিক 'এলানে' ছাপা হয়েছিল কিছুটা ভিন্ন চেহারায়। নিম্ন-মধ্যবিত্তের যে-জীবন গড়ে উঠেছে বাংলাদেশে তার নিজস্ব একটা চরিত্র আছে, সেই চরিত্রের কয়েকটি প্রতিফলনকে একত্র-করে এই বই।

সি ই চৌ

রমনা, ঢাকা
সেপ্টেম্বর ১৯৭১

পিছনে ফিরে

সেদিন খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে দেখলাম আমার বাল্য-সহপাঠী আবদুস সালামকে। খাচ্ছে। আরো অনেক পুরুষ-মহিলার সঙ্গে মিলে। অনেক কিছু বদলেছে তার, অনেক বেশী হৃষ্টপুষ্ট, খুব বেশী জাজ্বল্যমান। কিন্তু ঐ যে খাচ্ছে, খাবার প্লেট তার সামনে, ওটি বদলায়নি। ওই আগ্রহী সোৎসাহী ভঙ্গিটা আজন্ম।

খেতো আমাদের মোহাম্মদ হোসেনও। কিন্তু খুব লাজুক ভঙ্গিতে, প্রায় লুকিয়ে, যেন অন্যায় কাজ করছে একটা কিছু। কোন্‌টা গুরুপাক, কোন্‌টা লঘু—এই অতিপ্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য বইয়ের বাইরে ওর কাছেই পাওয়া যেত শুধু। বাড়ির বড় আদরের ছেলে ছিল মোহাম্মদ হোসেন। আপিস-ফেরতা ওর আব্বা ওকে দু'ঘণ্টা রোজ পড়াতেন নিয়মিত, গৃহবাসী আম্মা অত্যন্ত শশব্যস্ত থাকতেন সমস্ত দিন। এসব খবর ওর কাছে থেকেই শোনা।

আরো অনেক কথা শুনতাম। শব্দের, বাক্যের দোলাচল ছিল অবিশ্রাম। অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলাম আমরা। পাশাপাশি বসতাম স্কুলে, প্রায় হাত ধরাধরি করে ফিরতাম বাসায়। বিকেলে দেখা না হলে মন খারাপ থাকত। সংখ্যাহীন ছিল আমাদের প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ। "কী ভীষণ ভালো ছেলে মোহাম্মদ হোসেন।" আমার আব্বা-আম্মা বলতেন। দু' বাড়ীতে যাতায়াত ছিল নিয়মিত। ভেতরে ভেতরে বোধ হয় আমার ক্ষোভ ছিল একটু, ঈর্ষা ছিল কিছুটা, তুলনায় যেন হার হয়ে যাচ্ছে আমার, যেন আমি অস অস করছি না, যেন সম্ভাবনায় খাটো আমি অনেকটা।

আবদুস সালাম অন্য প্রকৃতির। হৈ হৈ করত, যা পেত তাই খেতো আর পড়া পারত না। মোহাম্মদ হোসেন খাবার আনত বাড়ি থেকে, টিফিনের ছোট্ট কৌটায় করে। আমি আনতাম না, যেমন অনেকেই আনত না, সময়-সময় কিনে-টিনে খেতাম, অনেক সময় ভাগ পেতাম—মোহাম্মদ হোসেনের কৌটা থেকে। আবদুস সালাম সুযোগ পেলেই কেড়ে নিত। আবদুস সালাম বাড়ন্ত ছিল, শরীরেও, বয়সেও। সেবার নতুন ক্লাসে উঠে দেখি আগে থেকেই সে বসে আছে সেখানে, যেন আমাদের পৌঁছার অপেক্ষায়। 'পুঁটি মাছ' বলতো সালাম, মোহাম্মদ হোসেনকে। হাসি-ঠাট্টা করত, সুযোগ পেলেই। বলত, আস্ত ভেজে খাব। দেখে নিস্।

একদিন টিফিন পিরিয়ড সেরে দু'বন্ধু বসেছি পাশাপাশি। ইতিহাসের ক্লাস। নিয়ম ছিল, বই না-আনলে শাস্তি হবে। খোঁড়ামতন ছিলেন ইতিহাসশিক্ষক। ইতিহাসের খ্যাতনামা চরিত্রের নামে নাম ছিল তাঁর, ছাত্রদের দেয়া-নাম। মারতেন না কাউকে। সে-অভ্যাস শিক্ষকদের অন্য কারো কারো ছিল। এমনিতে মিষ্টি করে কথা বলতেন। কিন্তু যখন ক্রুদ্ধ হতেন কারো উপর, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে আসতেন অপরাধীর দিকে, তখন ইতিহাসখ্যাত চরিত্রের নামে নামকরণের যাথার্থ্যটা অতিশয় স্পষ্ট হয়ে উঠত, পদপৃষ্ট পরাধীনের মত হিম হয়ে যেতাম আমরা, ত্রাসে।—সেদিন ক্লাস শুরু হবে, এমন সময় আকরাম—।

আকরামকে মনে রাখবার কোন কারণ ছিল না আমার। নিতান্ত সাধারণ ছেলে, আমার সঙ্গে কোন অন্তরঙ্গতা ছিল না, কোন ঔৎসুক্য ছিল না তার বিষয়ে। সেই বর্ণহীন, আকর্ষণবিহীন আকরাম হঠাৎ হাঁউমাউ করে উঠল, বই নেই তার! খুঁজল। জিজ্ঞেস করল একে-ওকে। কোন হদিস নেই প্রাণরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক সেই বইয়ের। এমনও তো হতে পারে যে আনেনি; বাড়িতেই ফেলে এসেছে ভুল করে—কেউ কেউ বলতে চাইল। না, না, সেটা সম্ভব নয়। আমরা জানতাম সেটা সম্ভব নয়। ইতিহাস বই আনতে কারো ভুল হয় না, যার হয় সে ক্লাসে চুপ করে বসে থাকে না।

"বই কোথায়?"—সেই ঐতিহাসিক কণ্ঠস্বর। আকরাম হোসেন কেঁদেই ফেলল ভঁ্যা করে।

"চুরি গেছে"—কোনমতে বলল, চোখ মুছতে মুছতে।

"কে নিয়েছে, ফেরত দাও।" বলে হুঙ্কার করে উঠলেন। কিন্তু কোন ফল হয় না তাতে।

"চোর এখানেই আছে। পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি আমি, বইএর মধ্যে এসে পড়ুক, তারপর সার্চ করে দেখব আমি প্রত্যেককে!" যেন ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা আছে তাঁর হাতে। অন্য কোন সময় হলে মন্তব্য করতাম, হাসাহাসি চলত নীরবে, আমি মোহাম্মদ হোসেনের হাতে চিমটি কাটতাম, নয়ত ও আমার হাতে। কিন্তু এখনকার অবস্থা অন্য রকম। আমরা অকম্প্র বসে আছি। যেন আমরা প্রত্যেকেই চোর, আসল চোর ধরা পড়ার আগে। চোর ধরা পড়ুক—এমনটা চাইতেও সাহস পাচ্ছি না, সন্দেহ হচ্ছে নিজেকেও। সমস্ত ক্লাস-জুড়ে একটা স্তব্ধ, জমাট আতঙ্ক। ইতিহাস-শিক্ষক ঘড়ি দেখছেন হাতের।

কিন্তু সত্যি বুঝি ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা ছিল ইতিহাস-শিক্ষকের। হারানো বইটা বেরিয়ে এল, মোহাম্মদ হোসেনের ব্যাগের ভেতর থেকে। বুঝি তৈমুর লঙ-এর চেয়েও অধিক ছিল তাঁর শক্তি। আমাদের জানা ছিল না অতটা।

আমাদের ব্যাগ ছিল না। আমরা বলতাম, উপরের ক্লাশে উঠেছি, ব্যাগ এখন বেমানান, কিন্তু মোহাম্মদ হোসেনের ছিল। ওর আম্মা তৈরী করে দিয়েছিলেন। না বললে শুনতেন না, আর ভীষণ ভাল সেলাই করতেন ভদ্রমহিলা। সেই ব্যাগের একেবারে উপরে পরিপাটি সাজানো আছে বইটি।

"কি করে ওখানে গেল বই?"—এই গর্জন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

শুধু গর্জন নয়, ইতিহাস-শিক্ষক দৌড়ে এসেছিলেন। যে ভঙ্গি করেছিলেন তার বিশদ আমার মনে নেই, আতঙ্কটুকুই শুধু অক্ষয় হয়ে আছে—আজো।

"জানি না!"—কান্নার বেগ ঠেলে বলতে চেয়েছিল মোহাম্মদ হোসেন। কিন্তু সে-শব্দ বোধ হয় আমিই শুধু শুনেছি। ইতিহাস-শিক্ষকের অতি সুন্দর বাচনভঙ্গি ততক্ষণে সরব হয়ে উঠেছে—যে-কণ্ঠের ক্লান্তিহীন প্রবাহে রাজাবাদশারা জীবন্ত হয়ে উঠত, যুদ্ধবিগ্রহ রক্তপাত ঘটে যেত চোখের সামনে, উত্থান-পতন ঘটত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের সেই কণ্ঠস্রোত বইয়ে দিয়েছে মহাপ্লাবনের ঢল। তাকিয়ে দেখি মোহাম্মদ হোসেন, আমার পাশে-বসা মোহাম্মদ হোসেন, আর আমার অতিপরিচিত অতিশয় নিরীহ ছোটখাটো বন্ধুটি নেই, অতিশয় চতুর ও ছদ্মবেশী এক দুর্বৃত্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর আব্বা-আম্মাও রেহাই পেলেন না। দেখি ওদের বংশ ও জন্মের সমস্তটা ইতিহাস ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে এসে ঘর ভরে ফেলেছে, একেবারে অন্ধকার করে দিয়েছে, দুপুরের সেই ক্লাস-ঘর।

"স্যার, টিফিন-পিরিয়ডে আমি বাইরে ছিলাম। এর সঙ্গে ছিলাম" —বলবার একটা সর্বস্বপণ চেষ্টা নিয়েছিল মোহাম্মদ হোসেন। কিন্তু শিক্ষকের তখন সেই অবস্থা নেই, অবকাশ নেই কর্ণপাতের। তাঁর ভাষায় 'মৃদু সংশোধনমূলক শাস্তি' হল মোহাম্মদ হোসেনের। বাকি তিন পিরিয়ড হাঁটু-গেড়ে হাতে ভর রেখে বসে থাকবে সে।

উঠে চলে গেল মোহাম্মদ হোসেন। ব্লাকবোর্ডের পাশে, ময়লা চৌকির কাছে। তারপর আবার সূচনা ইতিহাসের প্রচণ্ড জয়যাত্রার।

আমার ভেতর কথারা জেগে উঠছিল—ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত, ক্ষুব্ধ সব কথা। একের পর এক। বলার উদ্বেলতা ছিল মনে, কিন্তু শক্তি ছিল না গলায়। আমি বলতে পারিনি, বরং মনোযোগ দিয়ে শুনেছি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকাহিনী। শুনতে হয়েছে। নিয়ম ছিল শেষ পাঁচ মিনিট জেরা হবে, মেপে দেখা হবে কতটা গ্রহণ করলাম ইতিহাসের পাঠ, আর সেদিন আমার ভয় ছিল বোধ করি আমিই হব জেরার এক নম্বর আসামী—আমিই তো মোহাম্মদ হোসেনের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।

কিন্তু ঐ শোনার মধ্যেই যেন কানে এল—"আবদুস সালাম করেনিতো কাজটা?" যেন ফিস্‌ফিস্ করছে কারা। বলতে পারত অনেকেই। স্বাভাবিক ছিল, ছিল প্রত্যাশিত। মোহাম্মদ হোসেনকে

—লাজুক, নম্র, ছোটখাট মোহাম্মদ হোসেনকে—ভালোবাসত অনেকেই। আবদুস সালামকেও চেনা ছিল সকলেরই। হয়ত ওটা মনের ভুল। হয়ত বলেনি কেউ। কিন্তু বলতে পারত বৈকি। আবদুস সালামের করার মত কাজ এটা। যোগ্য কাজ। তার রাগ ছিল মোহাম্মদ হোসেনের উপর, একবার নালিশ করেছিল মোহাম্মদ হোসেন ওর নামে, ধমক খাইয়েছিল। ব্যাপারটা নিয়ে হাস্যকৌতুক করত হামেশাই। আবদুস সালাম বসেছে ঠিক পেছনের বেঞ্চে, ব্যাগ খুলে বই ঢুকিয়ে রাখা মোটেই কোন কষ্টের কাজ নয়। কিন্তু আবদুস সালামের দিকে আমি তাকাতে পারিনি সাহস করে। ভয় ছিল হয়ত দেখব হাসছে সে মিট্‌মিটিয়ে, নাড়াচ্ছে চোখ। পেছন থেকে তার দৃষ্টি দগ্ধ করছিল আমাকে।

তাকাতে পারিনি আমি মোহাম্মদ হোসেনের দিকেও। যখন হাঁটু-গেড়ে বসেছিল তখন না, তখনো না যখন বাসায় ফিরলাম দু'বন্ধুতে, তখনো নয় যখন বিদায় নিলাম দোর-গোড়ায়। অনেকদিন না, আর কোনদিনও না। ওর চাইতে লজ্জা যেন আমার হয়েছিল বেশী।

সত্য বার হয়ে আসবে। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। দেখবে, জানবে সবাই। আবদুস সালামের শাস্তি হবে। লজ্জিত হবেন তৈমুর স্যার, মাফ চাইবেন করজোড়ে। গাধার টুপি পরিয়ে সারা স্কুল ঘোরানো হবে আবদুল সালামকে। হেডমাষ্টার নিজের হাতে দেবেন শাস্তি, দাঁড়িয়ে থেকে পরিয়ে দেবেন টুপি। কঠিন মানুষ তিনি, বুদ্ধি অসাধারণ, রোজ একটা করে রুই মাছের মুড়ো খান, বাজার করেন নিজে।

আমি মনে মনে বলছিলাম এসব কথা। কিন্তু হল না। কিছুই হল না। পরের পিরিয়ডে যিনি এলেন তিনি অঙ্কের শিক্ষক। এমনিতে ভীষণ বদমেজাজ, পরীক্ষার নকল ধরতে পারদর্শী, তদুপরি চক-ডাষ্টার নিয়ে তাঁকে ঘনঘন ছোটাছুটি করতে হয় ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে। আশঙ্কা ছিল হয়ত প্রহার করবেন মোহাম্মদ হোসেনকে। কিন্তু সব শুনে উল্টো বললেন, "না, না, এটা হতেই পারে না। ওর বাবাকে আমি

চিনি। ঠিক আছে, তুমি বস গিয়ে সিটে, তোমার বাবাকে বলব, শাস্তি দিতে হলে তিনিই দেবেন।"

উঠে আসছিলো মোহাম্মদ হোসেন, কিন্তু তার আগেই হৈ হৈ করে উঠল আবদুল সালাম। না, না, উঠবে কেন? কড়া নির্দেশ আছে যে ইতিহাস স্যারের, চোরের শাস্তি যেন মওকুফ না হয়। তখন নিশ্চিন্ত বোঝা গেল একাজ অবশ্যই আবদুস সালামের। শেষ পিরিয়ডে এলেন ভূগোল-শিক্ষক। বৃত্তান্ত জেনে মন্তব্য করলেন, "সাধু বেশে পাকা চোর অতিশয়।"

ফেরার পথে কোন কথা হয়নি আমাদের। অনেকক্ষণ নয়। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল মোহাম্মদ হোসেন—"আব্বাকে কি বলব?"

একই দিনে সেই আমার দ্বিতীয় জ্ঞান লাভ। প্রথম ঘায়ে দুনিয়াটাকে সাদায়-কালোয় ভাগ করেছিলাম আমি, লোকেরা হয় মোহাম্মদ হোসেন নয়ত আবদুস সালাম। কিন্তু তবু একটা শিখা জ্বলছিল মনের ভেতরে, মোহাম্মদ হোসেনের আব্বা ছাড়বেন না কিছুতেই, কড়া চিঠি দেবেন হেডমাষ্টারের কাছে, সেই চিঠিতে বেড়াল বেরিয়ে আসবে থলে থেকে, শাস্তি হবে আবদুস সালামের। মামলা করবেন দরকার হলে, লড়বেন শেষ পর্যন্ত। এখন দেখছি ওর আব্বাকেই উল্টো ভয় পাচ্ছে মোহাম্মদ হোসেন। বোধ হয় ঐদিনই কৈশোরের আনন্দকে জীবনের সত্য এসে গ্রাস করে নিল। ঐদিনই, ঐখানেই, আমার কৈশোরের অপমৃত্যু।

"সালাম হয়তো করেছে কাজটা"—আমি বলেছিলাম ওকে।

"কে বিশ্বাস করবে বল?" এ-প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারিনি।

আর কেউ করেওনি বিশ্বাস। বরং পরের দিন স্কুলে এসে দেখি খবরটা অনেক বড় হয়ে অনেক বেশী রঙ্গীন হয়ে আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।—মোহাম্মদ হোসেন সেদিন স্কুলে আসেনি। এর পর আরো অনেক দিন আসেনি। আমার মনে হয়েছে যেন স্কুলশুদ্ধ ছেলে আমাকে দেখাচ্ছে। আঙ্গুল তুলে, বলছে, দেখ, সেই যে মোহাম্মদ হোসেন, বই-চোর, এই তার বন্ধু।

কপাল ভাল, আমার আব্বা বদলি হয়ে গেছিলেন বছর না-ঘুরতেই। তারপর মোহাম্মদ হোসেনের সঙ্গে দেখা হয়নি আর। কিন্তু আবদুস সালামের সঙ্গে হয়েছে—জীবনে, লোক-মুখে, সবচেয়ে বেশী স্মৃতিতে। মোহাম্মদ হোসেনের চেহারা এখন স্পষ্ট-করে কল্পনা করতে পারি না, বোধ হয় কল্পনা করতে চাই না আসলে। কিন্তু আবদুস সালাম কেমন স্পষ্ট, জীবন্ত, প্রত্যক্ষ। তার সেই খাড়া নাক, মুখের দাগ আমি কতদিন কত হাজার মুখে দেখেছি, দেখে চমকে উঠেছি আতঙ্কে। শুনেছি ইতিহাসের সেই শিক্ষক বিস্তর উন্নতি করেছেন। তবু তাঁর ব্যাপারে আমার কোনই আগ্রহ বা কৌতূহল নেই—আশা করি তিনি ক্ষমা করবেন অকৃতজ্ঞ এই ছাত্রকে।

একদিন আবদুস সালামই তুলেছিল কথাটা।

"মোহাম্মদ হোসেনকে মনে আছে তোর? সেই যে—"। আমি আর শুনতে চাইনি, দেখতে চাইনি সেই অতীতকে, চলতি একটা বেবী ট্যাক্সিকে থামিয়ে বলেছি—"চলি ভাই, আর একদিন কথা হবে, ভীষণ তাড়া আমার।"

সত্যি তাড়া ছিল। পালিয়ে যাওয়ার।

চাঁদকে দেখা

ভর সন্ধ্যায় প্রতিবেশীর আদুরে মেয়েটা যখন সঙ্গীত-চর্চায় উদ্যত হয় তখন কি আপনি আতঙ্কগ্রস্ত হন? আমি হই, কিন্তু সেটা এই ভয়ে নয় যে, সে বেসুরো গাইবে অথবা চীৎকার করবে জোরে। 'আমারে ভুলিয়া যেয়ো মনে রেখো মোর গান' বলে এমন এক ধমক দেবে যে ঐ গান ছাড়া আর সব কিছুই হয়তো ভুলে বসব। বেসুরো তো গাইবেই। হাঁটি-হাঁটি পা-পা করতে করতেই একদিন গটমট খটমট করে হাঁটতে শিখবে। গলার শিশু হাঁটি-হাঁটি পা-পা করছে কল্পনা করতে আমার কোন আপত্তি নেই। তাতে কল্পনার উপর যদি চাপ পড়ে তা-ও সই। প্রতিবেশীর জন্য কি এইটুকুও করব না?

না, ভয় গলাকে নয়, অসুরেরও নয়। ভয় চাঁদকে। গানের চাঁদকে।

সন্ধ্যায় চাঁদ উঠলে কার কি বলার থাকে? বরং সেতো খুশিরই খবর; এই যে ভিড়ের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে আছি, জায়গা নেই নীচে, এর মধ্যে আকাশে যদি চাঁদ ওঠে টলমল ঝলমল করে তো সে ভালোই —খুবই ভাল। রূপালী জ্যোৎস্না গলে গলে পড়ছে—এই দৃশ্য দেখে দু'দণ্ড শান্তি মিলবে। কিন্তু এ-মেয়ের গান থেকে যে-কোন মুহূর্তে যে-চাঁদ লাফিয়ে উঠবে বলে আশঙ্কা করছি সেটা সাংঘাতিক। চাঁদ মানুষকে পায়, চাঁদের ফাঁদ সর্বত্রই পাতা। চাঁদে-পাওয়া মানুষকে পাগলই বলা হয়ে থাকে। এই যে মানুষ চাঁদে পৌঁছার জন্য দৌড়ঝাপ করছে এটাও এক ধরনের পাগলামোই আসলে। চন্দ্রোগাক্রান্তরা চাঁদে পৌঁছে হয়তো সব রহস্য সাফ করে দেবেন। চাঁদের বুড়ি অনেক আগেই মারা পড়েছে, এবার চাঁদ নিজেই যায় যায়।

কিন্তু তবু চাঁদের একটা শেষ আশ্রয় মনে হয় ঠিকই থাকবে, যতদিন আধুনিক বাংলা গান আছে। আমাদের গান লিখিয়েদেরকে

চাঁদে পায়নি, চাঁদকেই বরং তারা পেয়েছেন, পেয়ে তাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করেছেন। কে কাকে আশ্রয় দিচ্ছে সে একটা ধাঁধাঁই বটে শেষ পর্যন্ত। চাঁদের বহুবিধ ব্যবহার অবশ্যই আছে। ক্লাব, সিনেমা হল, এমনকি আলকাতরার নামেও চাঁদ থাকে, থাকতে পারে। সেই ইংরেজ নিশ্চয়ই রসিক ছিল চাবুককে যে নাম দিয়েছিল শ্যামচাঁদ। অর্ধচন্দ্রেও ব্যাপার তা-ই। আগের দিনে বিয়ের চিঠির মস্তকে চাঁদ-তারার শোভা সৃষ্টির রেওয়াজ ছিল, এখন মধুচন্দ্রিমা চালু হয়েছে। কিন্তু গানের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। তার চেনা-অচেনা সম্ভব-অসম্ভব নানান রূপ। ঘুম-ভাঙা, নিশি-জাগা, চৈতালী, ফাল্গুনী, ডুবু-ডুবু, নিবু-নিবু, কাঁদো-কাঁদো, হাসি-হাসি, ঘুম-ঘুম, ফাঁদ-পাতা, যাদু-জানা—যে-কোন প্রেমিকার তুলনায় চঞ্চলা সে অনেক বেশী, বেশ পরিবর্তনে অনায়াসে হারিয়ে দেবে দস্যু মোহনকে। এই এল পূর্ণ হয়ে, কিন্তু ঠিক পাশের গানেই চোখে পড়ে দ্রুত যাচ্ছে পালিয়ে। এই যে কল্পনার আঁকশি দিয়ে চাঁদকে নিয়ে টানাটানি, এই যে কি যাদু বাংলা গানে, গান দেখি চাঁদকে টানে—এই অবস্থাটা এমন হাল করেছে আমার যে, আমি ভয় পাই, গানের রেশ মাত্রেই আতঙ্ক হয়, তার ঝাপি দেখলেই শিরশির্ করে ভেতরটা। কারো বাড়ীতে বেড়াতে গেছেন, গিয়ে ঢুকেই যদি দেখেন খাস ড্রয়িং রুমে হারমোনিয়াম ও বাঁয়া-তবলা অত্যন্ত নিরীহ মুখ করে নিশ্চুপ বসে আছে কোনা খুঁজে নিয়ে, তা'হলে আপনি হয়ত উদ্বিগ্ন হন, একটা অস্বস্তির মধ্যে পড়েন, না-জানি কখন গৃহকর্ত্রী স্বয়ং ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে করে দুলে-দুলে ওঠেন, ফুলে-ফুলে বলেন, আমি বনফুল গো। সেই কল্পিত দোদুল্যমানতায় হয়ত সুস্বাদু নাস্তাপানির সম্ভাবনাটাও নিতান্ত তিতো হয়ে ওঠে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমারো হয়, হয়েছে। গানের ভয়ে নয়, চাঁদের ভয়ে, না-জানি কখন কোন মুহূর্তে আচমকা আস্ত এক চাঁদ বেরিয়ে আসে মস্ত এক লম্ফ দিয়ে।

গান লোকে গাইবেই। এক কালে এই স্রোতে বাধা ছিল, ধারা এখন বাঁধ ভেঙেছে। যাদের কাজ নেই তারা কাজ না-পেয়ে গানকে

পাক, আর কাজওয়ালাদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে গানের মাধবী-লতা উঠুক জড়িয়ে-পেঁচিয়ে, এ আমি খুব চাই। বেসুর ও অসুরের থরহরি জগঝম্পের মাঝে সুর বাঁধার চেষ্টা মাত্রেই প্রশংসা পাবে। কিন্তু গান কি চাঁদকে রেহাই দেবে, দেবে কি অব্যাহতি? আমি ভরসা করি না। সাহস পাই না আশা করতে।

চাঁদকে আমরা মামা বলি। এ বোধ হয় সেই অতীত যুগের স্মারকচিহ্ন সংসারে যখন মায়েদের কর্তৃত্ব ছিল প্রধান। সেই জোরেই, মায়ের জোরেই, জোর ছিল মামা'র। হালে মা'দের জায়গাগুলো স্ত্রী'রা নিয়ে নিয়েছেন, সেই দিক থেকে চাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটাও হয়ত দাবি রাখে পুনর্বিচারের। কিন্তু মুস্কিল এই যে, কি কারণে জানা যায় না, স্ত্রী'র সূত্র ধরে জড়ানো যায় যে মধুর একটা আত্মীয়তার সম্পর্কে সেই পদবীটা মোটেই প্রীতিকর ডাক নয় আমাদের দেশে। শ্যালকেরা আমাদের সকলেরই প্রিয় বটে, কিন্তু ঐ নাম ধরে ডাক-হাঁক করলে সত্যকারের শ্যালক ভিন্ন অন্য যে-কেউ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন, এবং এমনকি সত্যকারের শ্যালকও আহ্লাদে আটখানা হবে না যদি হাঁক-ডাকটা কিছু জোরে-শোরে হয়। চাঁদের সঙ্গে ঐ সম্পর্ক একেবারেই অচল, খুব রাগের সময়েও বটে। মামা-ই ভালো।

তা'ছাড়া গুরুসদয় দত্ত তাঁর আই-সি-এস বুদ্ধি ও তৎপরতা নিয়ে যতই বলুন না কেন, সূর্যকে মামা ডাকার চাইতে চাঁদকে ডাকা অনেক সহজ, অনেক বেশী যথার্থ। যতই আলো, আমার আলো আনুক না কেন, সূর্য আলোর চেয়ে অধিক আনে তাপ। ঘামে-পিপাসায় বিরক্তি-ক্লান্তি-অস্থিরতায় কাণ্ড ঘটে হতচ্ছিরি। ঐ যে বলি, আয় আয় চাঁদ মামা টিপ্ দিয়ে যা, ওই আব্দার সূর্য কখনো নেবে না। তার কাজ আছে ভিন্ন।

আব্দার চলতে থাকে। মামা কিছু বলেন না, গ্রাম্য নির্বোধের মত হাসেন শুধু মিট্‌মিট্ করে। অল্পবয়সে আর পাঁচটা অনিবার্য লক্ষণের সঙ্গে যখন কাব্য-লক্ষণও তেজিয়ে ওঠে তখন থেকেই চন্দ্র-পথব্রতী হই আমরা। আমি নিজে অবশ্যি কবিতার পথে যেতে

পারিনি, হয়ত চাঁদ আমাকে পথ দেখায়নি বলেই। শরৎচন্দ্র সাক্ষী, সোনা-গলা চাঁদের দিকে তাকিয়ে আমার কল্পনা আড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে ওঠে না মোটেই, বরং বারে বারে হাই তুলে ঘুমে ঢুলু-ঢুলু হয়ে পড়ে।

আগে আরো বেশী পড়ত। আজকাল হঠাৎ হঠাৎ অস্বস্তি ওঠে খচ্ খচ্ করে, আচমকা-আচমকা খেয়াল হয়, তাই তো, কে জানে এই বাংলাদেশের কত বিরহীর নিঘুম আত্মা চাঁদের উদ্দেশ্যে শোক, অনুতাপ, খেদ, কামনার বাষ্প পাঠাচ্ছে এই মুহূর্তে। ঐ বাষ্পে বস্তুর অভাব, নচেৎ চাঁদের বিপদ ঘটত, হয়ত হারিয়ে যেত সুচিরকালের জন্য। হারায়নি, কিন্তু চলছেই সেই কাজ। সেই বাষ্প-প্রেরণ। এই ভাবনায় পেলে ব্যাঘাত ঘটে নিদ্রার, বাষ্প পড়ে চোখে—যে-বাষ্প খুব বেশী করে এসেছে কবিতা থেকে, গান থেকে, এবং বাংলা চলচ্চিত্রের অত্যাবশ্যক প্রেমের-দৃশ্য থেকে।

আধুনিক বাংলা কবিরাও কিছু কম করেননি কাণ্ড। সব চেয়ে বেশী করেছেন সেই কবি যিনি (প্রিয়ার) বাঁকা ঝোলা আধ-খানা চাঁদের সঙ্গে অসীম সাহসে আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হয়েছেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন কাব্য করে। কিন্তু এই বাহ্য, গান-লিখিয়েদের তুলনায়।

তবে একটা কথা সত্য, সেও ঐ গানের কথাই বটে, আকাশে চাঁদ ছিল মোর জন্মতিথিতে। বাংলাদেশে চাঁদকে শিরোধার্য কত লোক করেছেন, কত অসংখ্য মহাজন। বাঙ্গালী বাবুদের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "চন্দ্র ইহাদের গৃহে এবং গৃহের বাহিরে নিত্য বিরাজমান থাকিবেন—কদাপি অবগুণ্ঠনাবৃত। কেহ প্রথম রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র শেষ রাত্রে শুক্লপক্ষের চন্দ্র দেখিবেন, কেহ তদ্বিপরীত করিবেন।" কিন্তু তিনি নিজেও বঙ্কিম বটে, তবে চন্দ্রই—অন্ততঃ নামে। বিদ্রোহী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং সুভাষচন্দ্রও তাই। বৈজ্ঞানিক যিনি সবচেয়ে বড় আমাদের তিনি জগদীশচন্দ্র। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, প্যারী চাঁদ, টেকচাঁদ, চন্দ্রশেখর,

চন্দ্রনাথ এঁরা তো আছেনই, কিরণশশী, শশীবালা, চাঁদ মিয়া, কালা চাঁদ, চাঁদ বিবি—এঁরাও কম নেই। রবীন্দ্রনাথ সব দিক দিয়েই ভিন্ন, নামেও, সূর্যই, সূর্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু আমার জ্ঞান মতে সব চেয়ে মারাত্মক বস্তু হচ্ছে সোনার চাঁদ ছেলে। সোনার চাঁদ ছেলের যে বাড়ীতে উদয় ঘটেছে সে-বাড়ীতে বিপদ না ঘটে যায় না। একবার যদি চেনা হয়ে যায় এই চাঁদকে, তখন আর রক্ষে থাকে না। বাবা-মা ভাই-বোন সবাই মিলে তোয়াজ করে। তেলটা-ঝোলটা দুধটা-ননীটা সে-ই পায়, অন্যরা দেখে চেয়ে চেয়ে, নয়ত তুলে দেয় পাতে। দরকার হলে ধার করে, না-কুলালে বিক্রি করে। সোনায় যাতে খাঁদ না থাকে, যেন সোনার চাঁদ আরো বেশী সোনা হয়, খাঁটি হয়, নিরেট হয় একেবারে।

সোনা তখন তেজী হয়, দামী হয়। কিন্তু সেই সোনা কাজে লাগে না। বড় জোর আছে যে সে এই কথাটা নিয়ে বড়াই করা চলে, তা দেয়া যায় গোঁফে। কিন্তু ঐ সোনায় চাল-ডাল নুন-লাকড়ি আসে না। লণ্ডভণ্ড বাড়ি লণ্ডভণ্ডই থাকে, শুধু গুজব শোনা যায়, এ-বাড়ীতে একটা সোনার চাঁদ ছেলে আছে। কোথায় আছে খোঁজ করে না লোকে, চাঁদ কি আর আসমান ভুলে নেমে আসবে আঁস্তাকুড়ে? কোথায় এসেছে, কবে এসেছে শুনি? চাঁদ কি চাঁদ থাকবে যদি আসে নেমে?

তবে শুনেছি এমনি এক ছেলে একবার তার নাজেহাল পৈতৃক বাড়িতে আসবে কথা দিয়েছিল। শুনে বাপ ছুটলেন কুড়াল হাতে। ছেলে এলে ভোজ দেবেন, লাকড়ির জন্য গাছ কাটা চাই। প্রতিবেশীও এল সমান তেজে, কার গাছ কাটছ তুমি? সেই নিয়ে হট্টগোলের শেষে ঐ সোনার দামে-উত্তপ্ত অসহিষ্ণু পিতা দিলেন কুড়াল বসিয়ে—প্রতিবেশীর মাথায়।

চাঁদ আর আসে নি। খুনের দায়ে নাকি যাবজ্জীবন হয়েছিল পিতার।

এই ঘটনা কি হাস্যকর, নাকি করুণ? চাঁদ আসলে দুইই—যেমন হাসির তেমনি কান্নার, নির্ভর করে আপনি কে, কোন্ দিক থেকে দেখছেন, তার উপর।

আমি দেখি একদিক থেকেই। ডরাই আমি চাঁদকে।

কলা

জীবনে আমার বিস্তর কলা খাওয়া পড়েছে। অত খাইনি অন্য কোন ফল। কলাকে যেমন আলাদা করা যায় না তার শান্ত সুগন্ধ থেকে আমার বাল্যস্মৃতিকে তেমনি আমি পৃথক করতে পারি না কলা থেকে, কলাতে বাল্যকালে এমনি অন্তরঙ্গ মাখামাখি।

তারপর কলা থেকে সরে এসেছি বেশ কিছুটা। সেই ফল নেই গাছে, দুধও নাই গরুতে, এমনকি স্বাদও নেই মুখে।

মনের মধ্যে সেই কলার ফলবান স্মৃতি আন্দোলন করল সেদিন, একটা খবর পড়তে গিয়ে। কলার উন্নতির জন্য সাধনা চলছে। কি করে ভালো কলা আরো বেশী করে ফলানো যায় তার কায়দা শেখাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। শুনে খুব ভালো লাগল আমার। যেখানে চলেছে ঐ উদ্যম সেই জায়গাটা আমার বাড়ীর কাছে নয় মোটেই, এমনটা সম্ভব নয় যে, ঐ গ্রাম থেকে কলা আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাকায় ঝাকায় আমাদের এই প্রাচীন গলিতে। কিন্তু এমন হওয়া তো কিছুতেই অসম্ভব নয় যে, একদিন, কোন একদিন, যাবো আমি ঐ পথে, হয়ত ট্রেনে চেপে। তখন খাঁ খাঁ দুপুর। পারদ লাফ দেবে এক শ' দশে। ওদিকে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি আম-পাকানো ভিড় সেদিন সেই কামরায়। চাপাচাপির ভেতরও খুব চেপে বেপরোয়া ঘুম আসবে আমার। থেকে থেকে ঝুঁকে-ঝুঁকে এলিয়ে পড়বো আমি, সামনের দিকে। ঘাম মুছতে-মুছতে মৃদু-মন্দ গালমন্দ করবো দেশের আবহাওয়াকে। এমন সময়—

এমন সময় মনে হবে স্বপ্ন দেখছি। ট্রেন থামবে মাঠের ভেতর ষ্টেশনে। আড় চোখে, তন্দ্রার মধ্যে, তাকিয়ে দেখে চমকে উঠব হঠাৎ।

এসেছে তারা, ঝাঁকায় চড়ে। কলা। কলা। কলা। যেন দেবশিশু। যেন তাদের জগতেই পৌঁছে গেছি স্বপ্নের মধ্যে। কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ। হুড়মুড় করে শোরগোল তুলে কিনবো আমরা। উন্নত চাষের সেই তরতাজা রম্ভাদের খোলসমুক্ত করবো যখন, যখন তাকিয়ে দেখবো আন্তোপ্রান্ত, তখন মনে হবে খাই না-খাই, দেখে মরি। সার্থক হোক জীবন। কোথায় যাবে ঘুম, কোথায় যাবে ক্লান্তি, কোথায় বা সেই বিরক্তি—খাবো, অনেক, অনেক-করে খাবো সে-কলা। বেঁধে-সেধে হয়তো ঘরেও নিয়ে আসবো কিছুটা। মনে পড়বে দুধের কথা, কাঁকড়-ছাড়ানো ভাতের কথা, রাতে-ভেজানো চিঁড়ের কথা।

হতে পারে আকাশ-কুসুম কল্পনা এসব। উন্নত কলাতে-আমাতে এমন প্রসন্ন যোগাযোগ ঘটবে না কখনো আদৌ। না ঘটুক, তবু কোথাও কেউ-না-কেউ; আমার দেশবাসী ঐ রকম করে প্রাণভরে কলা খাচ্ছে এটা ভেবেও কম সুখ নয়। অন্যের মুখে ঝাল খাওয়ার চেয়ে অন্যের মুখে কলা খাওয়া অনেক বেশী মধুর।

কলার মতো ফল হয় না। "শতেক ধেনু, হাজার কলা। কি করবে আকাল শা—।" আকাল শা—কম যায় না, অনেক কিছুই করছে সে, মেরেছে, মারেছে লোক, মারবে আরো, আধ-মরা করে রাখবে অধিকাংশকে। তাই থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় ধেনু'রা সুবিধায় নেই, কলারাও তথৈবচ।

কিন্তু হাজার হাজার কলার কথা থাক, এক-একটা কলার কথাই ধরুন না কেন। কী তার রূপ, কী তার স্বাদ। কাদা-মাটির এই দেশে যত স্নেহ আছে গুপ্ত, প্রসন্নতা আছে অবগুণ্ঠিত, উজ্জ্বলতা আছে নিমজ্জিত, অকাতরে একত্রে এসে ধরা দিয়েছে তারা কলায়। কলাতে হট্টগোল নেই, আড়ম্বরও নয়, আছে নীরব ফলন, আছে কোমল নিরীহতা। আর তার গাছ? নিঃশব্দে ফল দিয়ে শুকিয়ে যায়, ঝড় আসবার আগেই ভেঙ্গে পড়ে, বন্যা এলে পড়ে নুয়ে। সব দিক দিয়ে, সকল মাপে হুবহু এক—খাঁটি দেশী ফল এক প্রকারের। লিচু কি জাম যাই বলুন, কাঁঠাল কি গাব, পেঁপে অথবা আনারস, কি তরমুজ—কেউ কি ওর-ধারে কাছে আসে, না আসবে? অমন যে রসালো আম

যাকে নিয়ে অত আমরা বড়াই করি দেশ-বিদেশে. ছুটি দিয়ে দিই স্কুল-কলেজ, ছুটে যেতে চাই গ্রামে কিংবা উত্তরবঙ্গে, সে কি পারবে, পারবে কলার সঙ্গে? ঘাম ঝরছে খেতে যেয়ে, ভন্ ভন্ করছে মাছি, হাতে মুখে রসের গড়াগড়ি। ছাপ পড়ল জামা-কাপড়ে। তারপর খেয়ে উঠে গুরু-পাকের গুরুতর ভারে নিজেই পড়লেন ঘুমিয়ে। ঘুম সেরে উঠে সে কী হাঁসফাঁস। ওদিকে কলা দেখুন, দেখতে দেখতে শেষ, ছেলকাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন হাতে তুলে, খেয়ে নিল গরুতে কি ছাগলে, নয়ত হেজে-মজে মিশে গেল মাটির সঙ্গে। ঝক্কি নেই, ঝামেলা নেই, বাহুল্য নেই কোন প্রকারের। না, কলার সঙ্গে পাল্লা দেবে কে?

সুবিধা কি শুধু খেতে? সুবিধা দেখাতেও। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে দেখাই, দেখাতে চাই, অহরহ মওকা খুঁজি দেখাবার। তবে অন্য কিছু না-দেখিয়ে, গুরুতর কিছু উন্মোচিত না-করে কলা যে দেখাই সেটা বরং ভালোই। কাজটা খুব সোজা। এক লহমায় খোসা-খুলে সামনে ধরতে পারা যায়। কোন অসুবিধে নেই। পাশাপাশি কল্পনা করুন কাঁঠাল দেখাচ্ছেন কাউকে! অথবা আনারস, বা তরমুজ! কলাই ভালো, প্রদর্শকের পক্ষে তো বটেই, দর্শকের পক্ষেও। কিন্তু এ-প্রদর্শনের উৎপত্তি কোথায়, এই কলা দেখানোর? যদি বলেন, উৎপত্তি ওর আকৃতির অশ্লীলতায়, তবে আমি বলতে বাধ্য হব, ব্যাধি আছে আপনার কল্পনায়। আমার ধারণা কথাটার উৎপত্তি হয়েছে একটা গাঢ় গভীর গূঢ় সত্য থেকে। কলা দেখলেই লালসা জাগে, যেন ডারউইন-বর্ণিত সেই পূর্ব-পুরুষের অভ্যুত্থান ঘটে আমাদের রক্তের ভেতরে। আমরা চাই, খেতে চাই, হা-করে ওঠে মুখ, ভেতরে ভেতরে। ওদিকে লালসা যখন জেগে উঠেছে, কামনা যখন অত্যুগ্র, তখন, সেই অস্থির সময়ে, যিনি দেখাচ্ছিলেন কলা, খুলে ধরেছিলেন সামনে, তিনি যদি আলগোছে সরিয়ে নেন, গলায় ফেলে গিলে ফেলেন নিজেই, তা'হলে রাগ হয় আমাদের, ক্ষোভ জাগে মনে, একটা পরাজয় এসে ঘিরে ফেলে চতুর্দিক থেকে। ওদিকে ঐ ভদ্রলোক দুয়ো দিচ্ছেন, হয়ত নীরবে নয়ত সরবে—'কলা খাও'। তবু যা-ই বলুন, 'কচু খাওয়ে'র তুলনায়

'কলা খাও' অনেক বেশী ভদ্র। আর দোষ তো কলার নয়, দোষ হচ্ছে দেখানেওয়ালার।

বাংলাদেশের মানুষ কলা খাচ্ছে হর্‌দম, তবে দেখছেও কম নয়। এই দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠ করুন, দেখতে পাবেন কতজনে কত ভঙ্গিতে কলা দেখিয়ে চলে গেছে মানুষকে, কত বিভিন্ন বিচিত্র নামে। আরো দেখাবে। বাস্তববাদী যাঁরা তাঁরা বলেন আরো অনেকে দেখাবে, অনেককাল ধরে দেখাবে। কেউ বলেন, কলা-ই আমাদের বিধিলিপি, আমরা দেখে-দেখে, ঠকে-ঠকে যাবো। চিরকাল গেছি, অনন্তকাল যাব। নিষ্ঠুর ইতিহাসের রদবদল ঘটবে না। কলা খেয়ে কলা দেখানোয়ালাদের শায়েস্তা করবার মত তাকত সঞ্চয় হবে না আমাদের, কোনদিনই না।

ওসব কথা গভীর কথা, আপাতত আমি কলা চাই। উন্নত ফলনওয়ালাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা আমাদের, তাঁরা আরো বেশী পরীক্ষা করুন। উন্নতি হোক। কে যেন কবে বলেছিলেন, "মুসলমানের পোলা, শাস্ত্র পড়লেও ছাড়ে না ত্যাল, খ্যাড় আর ক্যালা।" এই নাতিদীর্ঘ তালিকার প্রথম দু'টি যেমন-তেমন, তৃতীয়টি নিয়ে আমার কোন শরম নেই আমার মতে কলা যে খায় না সে বড় দুর্ভাগা।

বাঙালাদেশে সকলেই খায় বটে কলা, কিন্তু কলার যথার্থ গুণ মনে হয় বুঝেছিলেন তাঁরা-ই যাঁরা আর্টের নাম করেছেন 'শিল্পকলা'। এখন অবশ্যি শিল্পে আর কলায় ঐ গা-লাগালাগি সম্পর্কটা নেই, এক সঙ্গে ঘর করে না তারা, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। শিল্প এখন ইণ্ডাষ্ট্রী রূপে মাঠে-ময়দানে হৈ হৈ করতে চাইছে, নাকি দেশে শিল্পোন্নয়ন ঘটাবে। কলা আলাদা সংসার পেতেছে। তা-ই ভালো। কিন্তু শিল্প যদি কলাবতী হয়ে ওঠে তবে মুস্কিল, তবে সে হয়ত কলা দেখাবে আমা-দেরকে, যেমন কিনা সন্দেহ হচ্ছে আজকাল দেখাচ্ছে বলে, শিল্প আছে শুনছি, কিন্তু তার ফল দেখছি না। শিল্পায়ন যদি ফল ছেড়ে ছলা-কলা করে, যদি বলে 'কলা খাও' তবে রাজনীতির ইতিহাস ও শিল্পোন্নয়নের ইতিহাস একাকার হয়ে যাবে, প্রমাণ হবে যে, তারা-

অভিন্ন—কেননা আসলে তারা তা-ই। অভিন্নই বটে, তত্ত্বকথকেরা তা-ই বলেন।

ওদিকে কলা নাম নিয়েছে 'ললিতকলা'র। হয়ত তাতে অভিমান আছে। কিন্তু আসল কথা এই যে, ললিতই হোক আর শক্তই হোক আর্টকে যিনি কলা বলেন তিনি আর্ট ও কলা উভয়েরই কদর করেন সত্যিকারের। আর্টও তো কলার মতই সুন্দর, সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর এবং প্রয়োজনীয়।

দুই কলাতে—গাছের ও আর্টের—মিল আরো এক জায়গাতে। গাছের কলা যেখানে-সেখানে হয়, কিন্তু ছুটে আসে শহরের দিকে। শিল্পকলাও তাই, শহরের জন্যই যেন, শহরের মানুষদের জন্য। এমনকি লোক-সংস্কৃতিও লোকদের ব্যাপার নয় আজকাল, বড়লোকদের ব্যাপার। আর দুই কলারই আক্রা যাচ্ছে দেশে। ফলন হচ্ছে না ভালো। ভালো মাটির অভাব, খুব অভাব যত্নের।

কিন্তু আমি নিজে কিছুতেই চাই না আর্টের কলা গাছের কলার মত নরম হোক, ক্ষণভঙ্গুর হোক, নিরীহ হোক। গাছের কলা তৈরীও আর্ট একটা, শক্ত আর্ট, কঠিন আর্ট, নইলে আবার বিশেষজ্ঞ কেন। সব আর্টকেই কঠিন হতে হয়। উভয় কলা-ই কলা দেখা-নোতে ব্যবহার হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি। আর্টের কলা কিছু কম যাচ্ছে না গাছের কলার চেয়ে। কঠিন হও, কঠিন হও—গাছের কলা আর্টের কলাকে এই কথা বলছে, আমি শুনতে পাই।

স্বপ্নে

স্বভাবের দিক দিয়ে যাঁরা চিন্তাপ্রিয় চিন্তিত হবার মত সুযোগের অভাব তাঁদের কখনই হয় না।

আমার এক পরিচিত অধ্যাপক-ভদ্রলোক চিন্তায় পড়েছেন পরীক্ষার খাতা দেখে। ছাত্ররা যে খারাপ লেখে, তারা যে অজ্ঞ কি অবোধ সে নিয়ে তাঁর ভাবনা নয়। অজ্ঞতা সে তো থাকবেই, তার প্রতিকার আছে। কিন্তু তিনি দেখতে পেয়েছেন অসুখ—অতিশয় ভীষণ কঠিন এক অসুখ। বাংলায় রচনা লিখবার বিষয় ছিল তিনটি ঃ 'একটি শীতের রাত', 'উড়োজাহাজে ভ্রমণ', ও 'আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা'। যিনি প্রশ্ন করেছিলেন, অনুমান করা যায়, তাঁর বাসনা ছিল পরীক্ষায় পাশ করতে দেবার আগে পরীক্ষার্থীদের কল্পনাটাকে একটু বাজিয়ে নেয়া। খাতায় দেখা গেল আর্টসের বেশীর ভাগ ছেলের পছন্দ শীতের রাত। লেপের নীচে ঘন হয়ে শুয়ে ভূতের গল্প শুনতে তাদের যতটা আরাম তেমনটা আর কিছুতেই নয়। একজন অবশ্যি একটা বিপদের কথা লিখেছে। একবার তার ভারি প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেবার। কিন্তু এমনই শীত পড়েছিল সে-রাতে যে, সাধ্য কি লেপ থেকে বার হয়। ছেলেটি বোধ হয় সেই অত্যাচারের একটি বড় রকম শোধ নিল শীতের রাতের উপর নিবন্ধ লিখে। তবে উড়োজাহাজে চড়ার ব্যাপারেও উৎসাহী তরুণ-তরুণীও পাওয়া গেছে কিছু। একজন মনে হল খুব ভ্রাতৃবৎসল। লিখেছে ছোট ভাইকে প্লাটফর্মে বসিয়ে সে গেল দুইটি টিকেট কিনতে, ফিরে এসে দেখে ছোট ভাই বসে বসে চিনে বাদাম খাচ্ছে, তারপর তারা উড়োজাহাজে উঠে বসল, ইত্যাদি।

বোঝা যায় তার কোন কষ্ট হয়নি, ট্রেনের স্বাচ্ছন্দ্যেই ভ্রমণ করছে উড়োজাহাজে চেপে।

আর্টসের ছাত্রদের ঐ কাফেলায় উচ্চাকাঙ্ক্ষীর অভাবও তাই বলে খুব একটা ছিল না। একজন লিখেছে, সে হবে ডাক্তার, অপরজন হতে চায় ইঞ্জিনীয়ার। তাই যদি হবে তা'হলে কেন আর্টসে ভর্তি হল সে-খবর অবশ্যি জানায়নি। কতিপয় দেশহিতৈষী বাসনা রাখে দেশের উন্নতি করবে, গোলা ভরে তুলবে ধানে, পুকুর ভরে দেবে মাছে। কিন্তু কি করে করবে সে কথা উহ্য। সেটা বোধ করি ট্রেড সিক্রেট। উপচিকীর্ষু একজন তার প্রবন্ধ শেষ করেছে কবিতার লাইন তুলে দিয়ে 'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা', অন্য একজন বোধ হয় নজরুল-ভক্ত, 'লিখেছে, আমরা গড়িব নূতন করিয়া ধূলায় তাজ-মহল' তৃতীয়জন অতিনাটকীয়, শেষ করেছে আচমকা জয় বাংলা ধ্বনি তুলে।

কিন্তু শিরোপা প্রাপ্য এদেরই অন্য একজন সহপাঠীর। সে অসামান্য সাহসী ও উচ্চভাবসম্পন্ন। লিখেছে, তার প্রেমিকাকে নিয়ে পালাবে সে। সেটাই তার জীবনে সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা। সব প্ল্যান ঠিক আছে। সামনের শনিবারের রাতে 'কিচেন ঘরের পাশে প্রিয়া আসবে তার, অন্ধকারে, সংগোপনে। তারপর উভয়ের পলায়ন। কোন বাহনে সেই খবরটা পাওয়া গেল না, কোন পক্ষীরাজ ঘোড়া তৈরী থাকবে কি না তা তাদের মালুম নেই। তবে টাকা-পয়সার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছে। সে তার আব্বার বাক্স ভাঙবে, ওদিকে মহিলা ভাঙবেন তাঁর আব্বার, তদুপরি গায়ের অলঙ্কারপাতি আছে। ছেলেটির ভাষা দুর্বল, বানান ভুল অসংখ্য, গুরুচণ্ডালী পদে পদে, তবু সব কিছু ছাপিয়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার তপ্ত শিখা।

প্রেম নিয়ে বাড়াবাড়িটা অবশ্যি বাংলাদেশে নতুন কিছু ব্যাপার নয়। মেরেছিস কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না—এইটেই আমাদের বুনিয়াদী ভঙ্গী। শতেক খানেক বছর আগে একজন বাঙালী লেখক টের পেয়েছিলেন যে, 'উষ্ণদেশীয় লোকেরা প্রেম বিষয়ে রচনা

পাঠ করিতে বাসনা করে।' আমাদের আদি কবিতা যুদ্ধের বা প্রকৃতির নয়,—একান্তই প্রেমের।

হয়ত ঐ বাসনার কারণেই এই অভাব-অনটনের দিনেও চারিদিকে প্রেমের গল্পের ভীষণ ছড়াছড়ি দেখছি। এই সেদিন নামকরা এক মাসিক পত্রিকায় গল্পের এক কুতুবমিনারের সঙ্গে দেখা। গল্পের নামই 'কুতুবমিনার'। পড়ে দেখি মারাত্মক কাণ্ড। ছাত্রীটি দুম্ করে ইংরেজীর সুদর্শন তরুণ অধ্যাপকটির প্রেমে পড়ে গেল। তারপরই দমাদম সব ঘটনা—পড়তে বসে গায়ের প্রতিটি লোম শিউরে দাঁড়িয়ে ওঠে। প্রথমে শুভ-বিবাহ। পরে ঈর্ষা। একদা অপর একটি মহিলার সঙ্গে অধ্যাপকটি কথা বলছিলেন, ব্যাস, বলা নেই কওয়া নেই, ঈর্ষাকাতর সেই নায়িকা ফস্ করে দিল এ্যাসিডের এক বোতল ছুঁড়ে। বেচারার মুখ-চোখ পুড়ে ছারখার। অতঃপর নায়িকার পলায়ন, শুধু বাড়ী থেকে নয়, নিজের কাছ থেকেও। ধর্ম পাল্টাল, নাম বদলাল, fast life যাপন শুরু করল। শেষে দেখা গেল, কুতুবমিনারের উপর দাঁড়িয়ে গগ্‌লস্-পরা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মেয়েটি আলাপ করছে।

পাঠক, বলুন দেখি ভদ্রলোক কে? স্ত্রী হয়ে নায়িকা তাঁকে চিনতে না-পারেন না পারুন, আপনি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন গগ্‌লসের নীচে প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিটি কে!—ধরেছেন ঠিকই, সেই অভাগা স্বামীটিই। স্বামী এগিয়ে এল নায়িকার দিকে। নায়িকা এক-পা এক-পা করে পেছাচ্ছে। পেছাতে পেছাতে ঐ অত উপর থেকে পড়ে গেল একদম নীচে।

আরেকবার পড়েছিলাম আরেক অধ্যাপকের গল্প। বদলী হয়ে এসে তিনি প্রেমে পড়লেন ছাত্রীদের মধ্যে সব চেয়ে যে সুন্দরী তার। অতিশয় সম্ভাবনাপূর্ণ যুবক। নায়িকার বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন খুবই প্রফুল্ল। আদর চলল পাত্রের। প্রচুর হল আপ্যায়ন। তোয়াজও বলা চলে। শেষে যে-প্রতিশ্রুতি দেখা গিয়েছিল নবীন অধ্যাপকের মধ্যে তা পূর্ণ হল—তিনি মফস্বল কলেজ ছাড়লেন মস্তবড় সরকারী চাকরি নিয়ে। এবং অবশেষে দেখা গেল কার্ড বিলি হচ্ছে তার শুভ বিবাহের। পাত্রী অন্য মেয়ে ঐ শহরেরই সেরা ধনীর একমাত্র মেয়ে। সেও ছাত্রী ঐ

কলেজেরই। নায়িকার বাপ-মা লাফ-ঝাপ দিলেন, আত্মীয়-স্বজন ছুটে এলেন দুঃখ করতে। শুধু পরিত্যক্ত নায়িকাকে দেখা গেল অবিচল। যাঁরা তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁদবে বলে তৈরী হয়ে এসেছিলেন তাঁদের সরিয়ে দিয়ে সে বসল গিয়ে টেবিলে, খুলল তার পাঠ্য বই। ঐযে খুলেছে বই, আর বন্ধ করেনি। ভেতরের গুপ্তমেধা এতদিন সুযোগ পেল। নায়িকা আর দ্বিতীয় হয়নি কোন পরীক্ষায়। দেশ ছেড়ে বিদেশে গেছে—সেখানেও বিস্তর সুনাম এসেছে অতি অনায়াসে।

বহুদিন পর বড় এক ষ্টেশনের আপার ক্লাশ ওয়েটিং রুমে ঢুকতে যাবে, দেখে ভেতরে সেই নায়ক। মূল্যবান ভঙ্গি নিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় খবরের কাগজ পড়ছেন। নায়িকা তাড়াতাড়ি গগ্‌লস্ এঁটে নিল চোখে, তারপর ভেতরে ঢুকল ধীরে ধীরে। ওয়েটিং রুমে অধিকাংশ বাতিই জ্বলছে না। অস্পষ্ট, ছায়া-ছায়া। কেউ নেই আশেপাশে। —সুন্দর এঁকেছেন লেখিকা দৃশ্যটা। নায়কের সামনের টেবিলে এক গ্লাস পানি, বোধ হয় তাঁর অর্ডারলি রেখে গেছে। নায়িকা তার ব্যাগ খুলল। কি একটা বার করে নিল চট্ করে। তারপর আস্তে ফেলে দিল ঐ গ্লাসে।—মেয়ে আবার রসায়নের ছাত্রী।

এই পর্যন্ত পড়ে আমার খুব আতঙ্ক হল। পরবর্তী ঘটনা কি হতে পারে? কেউ দেখে ফেলবে? পাগল! এত কাঁচা কাজ করবেন লেখিকা! নায়ক খাবে না পানি?—তার হাতে লেগে গ্লাসটা মেঝেতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে? তাহলে আর এতদূর অগ্রসর হওয়া কেন শুধু শুধু। নায়িকা তো এই রকম একটা মুহূর্তের জন্যেই জীবনভর প্রতীক্ষা করছিল! নায়িকার ডায়েরী পড়ে আমরা জেনেছি যে, সে 'ভুলে গেছি' 'ক্ষমা করেছি' বলে বাইরে যতই প্রচার করুক না কেন ভেতরে তার সব সাধনার মূল সাধনা ছিল ঐ একটাই—হিংস্র প্রতিশোধ নেয়া, কঠিন শাস্তি দেয়া। তাহলে কি নায়ক ঐ পানি খেয়ে ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে? পাগল হয়ে যাবে? স্মৃতিভ্রষ্ট? অন্য ট্রেনে চেপে চলে যাবে সেই মফস্বলে, খুঁজতে থাকবে প্রাজ্ঞা মানসীকে? অথবা এমন হতে পারে কি না যে, ঐ পানি সেবনে নায়কের মাথার

সব চুল সাফ হয়ে গেল? আজদাহা এক টাক পড়ল প্রকাণ্ড মাথা জুড়ে? চুলের কথা ঘন ঘন আছে গল্পে। নায়ক খুব কেশ-সচেতন। কিন্তু বোধ হয় কৌতুকের ব্যাপার হবে সেটা। লেখিকা খুবই সিরিয়াস, হাসাহাসির ব্যাপার নয়, চাই পরিপূর্ণ প্রতিশোধ। এই রোগের প্রতিকার যে কি তা আমি জানি না। আর এ নিয়ে চিন্তিতও নই। বরং উল্টো বলতে পারি দিবাস্বপ্নের কথা পড়তে পেলে আমার খুব ভালো লাগে। পরীক্ষার ঐ সমস্ত খাতা পেলে আরাম করে পড়তাম।

যেমন পড়ি নতুন লিখিয়েদের গল্প, হাতের কাছে পাওয়া মাত্রই পড়ে ফেলি, খুঁজে এনেও পড়ে থাকি। কলেজ ম্যাগাজিনের গল্পগুলো আমার অত্যন্ত প্রিয়পাঠ্য। দেখি সেখানে অনায়াসে লোকজন খুন-জখম হচ্ছে। কানা হয়ে গেল নায়ক। সেই দুঃখে নায়িকা কেঁদেই খুন। নয়ত আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে ঢক্‌ঢক্‌ করে বিষ খেয়ে নিল নায়িকা, অথবা আস্ত আস্ত স্লিপিং পিল—ও বস্তু বোধ হয় বালিশের নীচেই থাকে সাজানো।

এ ব্যাপারে দেখেছি মেয়েদের—আশা করি তাঁরা অপরাধ নেবেন না—মেয়েদের কোমল হাতই সবচেয়ে বেশী কঠিন। তাঁদের গল্পের প্রথম বাঁকেই হয়ত নায়িকার গাড়ির সঙ্গে নায়কের গাড়ির বিষম এ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, ওঁরা নিজেরাই চালাচ্ছিলেন গাড়ি—ড্রাইভ করছিলেন। তারপর? তারপর নায়িকা চোখ মেলে দেখেন হাসপাতালের মূল্যবান কেবিনে ফুর-ফুরে বিছানায় শুয়ে আছেন। চারপাশে নামজাদা সব ডাক্তার মুখে মুখোশ এঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একজনেরই শুধু মুখ খোলা। নায়কের। তিনি নবীন যুবক, নির্নিমেষ তাকিয়ে আছেন নায়িকার মুখের উপর। এ্যাকসিডেন্টের পর সবলে নায়িকাকে তুলে নিয়েছিলেন কোলে। ধবধবে শার্টটা ছিঁড়ে ফেলে কপালে দিয়েছেন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে। তারপরের সব ব্যবস্থা তাঁরই। নায়িকা হাসলেন। সেই দেখে নায়ক বললেন, (কি মিষ্টি তাঁর গলার স্বর) "বাঁচালেন।" শুনে নায়িকা চোখ বুঁজে ফেললেন, ঠোঁট নড়ল, কিন্তু কথা বেরুল না। বেরুল না যে ভালোই হল, কেননা শায়েলা বলতে যাচ্ছিলেন, "কিন্তু আমি তো মরলাম, শায়েলা তো মরে গেছে। যাকে

দেখেছেন সে অন্য এক মানুষ। ও আপনারই। তোমারই।"
তারপর? তার আর পর নেই। —খুব ভালো লাগে পড়তে।

দিবাস্বপ্নে আমি কোন দোষ দেখি না। স্বপ্ন মানুষ দেখবেই। যতই আপনি বারণ করুন। আর দেখবেই যখন তখন দিনেরবেলা দেখাই ভালো। ঘুমালে যে-স্বপ্ন আসে সে আমাদের ইচ্ছার কর্তৃত্বটা মানে না। নিজের ইচ্ছায় আসে, আচরণ করে যেমন ইচ্ছা, এবং যখন ইচ্ছা যেমন ইচ্ছা চলে যায়। চাইলেই যে আসবে এমন কোন খত দেয়নি লিখে যে-সাজে চাইবেন সে-সাজেই যে আসবে সেই বা কে বলল? ব্যাপারটা বরং বিপক্ষেরই কিছুটা—চাইলেন স্বপ্ন দেখেন হাজির হয়েছে দুঃস্বপ্ন। নাক চাইলেন, নরুণ পেলেন! স্বপ্নপ্রাপ্ত জিনিসপত্র দিবাস্বপ্নেই পেতে হয়—

ঘুমানোর পর আমার স্বপ্ন আসে না। এলেও তাদের কথা মনে থাকে না। আর যাদের কথা মনে থাকে তারা তাদের মনে রাখতে চাই না আমি। সেইজন্য স্বপ্ন আমি দিনেমানেই দেখি। আর দেখি বলেই এখনো বেঁচে-বর্তে আছি। নইলে দুঃখ বলুন অভাব বলুন কোনটারই অভাব নেই জীবনে। দুধওয়ালার ঠকানো কিংবা বাড়িওয়ালার ধৃষ্টতা ইত্যাদি যে সব পীড়া আর পাঁচ জনের সেগুলো আমারো। এইসব অসুখের মধ্যে টিকে যে আছি কোনমতে সে ঐ দিবাস্বপ্নের জোরেই।

যে আমাকে ঠকালো তাকে যে আমি ঠকাতে পারি সে তো এই স্বপ্নেই। যে আমাকে অপমান করেছিল তাকে এমন কঠিন শক্ত শুনিয়ে দিলাম যে, সে বোবা হয়ে গেল সম্পূর্ণ। সেই যে মুখ বন্ধ করল আর খুলল না কোনদিন। শাসিয়ে দিয়ে গেছে যে ব্যক্তি বুদ্ধির এক চালে তাকে অনায়াসে দিলাম ফেলে মাটিতে—একেবারে কুপোকাৎ, একদম মাটিতে। দৈহিক মারপিটও কিছু কম চলে না। ওটাই বরং বেশী ভালো লাগে আমার। খুব আরাম হয়। যে-দাম্ভিক আমাকে জব্দ করে চলে যাচ্ছিল, তাকে থামালাম ডেকে। তারপর গালে এক চড়। প্রতিবাদ করল। আঘাত। প্রতিবাদ। পুনরায় আঘাত। আবার। আবার। শেষে দেখি সেই পরাক্রমশালী ক্ষমতাধর, যে আমার চেয়ে অনেক

বড়, এমনকি বপুতেও অধিক বিত্তশালী, দেখা গেল ধূলোয় পড়ে হাউমাউ করে কাঁদছে। মাফ্ চাইছে। আর করবে না জীবনে। দিলাম মাফ করে। "কিন্তু আর যেন এমনটি না হয়।"

আবার কখনো দেখেছি সব চেয়ে বড় শত্রু যে আমার তার মস্ত উপকার করছি। তার বাড়ীতে লেগেছে আগুন, আর সেইসব লকলকে শিখার ভেতর সমস্ত বিপদ বাধা তুচ্ছ করে দ্রুতপদে ঢুকে গেল যে অকুতোভয়ে, সে কে? আমি। কাঁধে করে নিয়ে এলাম সেই দুর্ভাগাকে। চোখের অবিরাম পানিতে দগ্ধ কাপড় ভিজিয়ে তখন সে বলল—"স্যার, চিনতে পারিনি। ক্ষমা করবেন।" কী একটা অপরূপ মহিমময় হাসি আমার মুখে।

এইরকম চলছে। হরদম চলছে। যেদিন যত বেশী ঘটনা—যত অধিক ব্যর্থতা সেদিন ততবেশী দিবাস্বপ্ন। সন্ধ্যার পরই আমি সাধারণত দিবাস্বপ্ন দেখে থাকি। দিনের শ্রমশেষে যখন বিশ্রাম নিচ্ছি আয়াসে, তখন যে-সব কথা বলা হয়নি, যে-সব ভুল না-হওয়া উচিত ছিল, যে-সব প্রতিশোধ বাকি তারা চারদিক থেকে চারপাশে অতিক্রত এসে হাজির হয়।

রাত যত বাড়তে থাকে ততই দেখি উদ্বেল হয়ে উঠছে স্বপ্নরা। অনেকে খুন হয়ে যায়। হতাহতরা আমার আরামকেদারার চারপাশে পড়ে পড়ে গোঙাতে থাকে। ক্ষমা চায় ভিক্ষা। আর আমার মুখে আত্মতৃপ্তির অত্যন্ত দুর্লভ হাস্য। দিবাস্বপ্নে শ্রম নেই, স্বেদ নেই, খরচ নেই, পরাজয় নেই কোন প্রকারের।

চিন্তাপ্রিয় অধ্যাপক বলবেন—এতে সর্বনাশ আছে। জানো না সেই গল্প—তরুণ যুবক মাথায় করে ডিম নিয়ে যাচ্ছিল বাজারে. ডিম বেঁচে রাজারসমান উঁচু হয়েছে এটা দেখল স্বপ্নে। যখন রাজার মেয়ে হাঁটু গেড়ে বলল—আমায় বিয়ে করুন। সে বলল—না। বলতে যেয়ে যেই মাথা নাড়ানো অমনি ডিমের পতন?

জানি সেটা, কিন্তু বোকা যে, হাবা যে ঐ রকমের, তার ডিম ভাঙ্গবেই। ঐ যুবকের ডিম নীচে না পড়লে হয়ত চিলে নিয়ে যেত উপর থেকে।

আর একজনের ডিম ভেঙেছে বলেই কি সবাই ছেড়ে দেব স্বপ্নদেখা। উড়োজাহজে এ্যাকসিডেণ্ট হয় বলে কি উড়োজাহাজই উঠে যাবে?

চিন্তাপ্রিয়রা যাই বলুন, দিবাস্বপ্ন আছে বলেই আমরা সুস্থ ও স্বাভাবিক আছি। ওটা না-থাকলে আমাদের ইচ্ছাপূরণ হত কি করে? কোন দিক দিয়ে? কি উপায়ে? একেকটা দিবাস্বপ্নের শেষে আমাদের একেকবার করে নতুন জন্ম হয়—একি কম কথা?

তা ছাড়া আরো একটা বিষয় আছে ভাববার। সংসারে একান্ত আপনার বলতে কার কি আছে আমাদের? অনেকেরই নিজস্ব একটা কামরা পর্যন্ত নেই। কামরা ভাগ্যে যাঁরা ভাগ্যবান তাঁদের দরজাতেও আড়িপেতে আছে অনেক জন, আচমকা যদি দরজা খোলেন দেখবেন ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল কেউ কেউ। চোখও চলছে,—গোপনীয়তাকে সংহার করতে। এর মধ্যে ঐ দিবাস্বপ্নইতো মাত্র একটা এলাকা যেটা সম্পূর্ণ আমার। যেখানে আর কারো ঢুকবার সুযোগ নেই, হুকুম। যেখানে আমি একচ্ছত্র সম্রাটের ক্ষমতা নিয়ে বসে আছি। যা-ইচ্ছা তাই করছি। এমন দ্বিতীয়টা আর কোথায় খুঁজে পাব আমি? কে দেবে সন্ধান? যোগাবে চাবি?

দিবাস্বপ্নের ভেতর দিয়েই শিল্পকলার ক্ষেত্রে বড় বড় সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। বড় শিল্পী না হই, জীবনশিল্পী হব না কেন?

সবচেয়ে প্রিয় পশু

পশুদের ভেতর কোন্‌টিকে আপনার সবচেয়ে বেশী পছন্দ? কুকুর না গরু? নাকি ছাগল—হরিণ অথবা খরগোশ? জনে-জনে পছন্দের রকমফের হবেই।

আমার নিজের পছন্দ ঘোড়া। আমি ঘোড়ার ভক্ত বলতে পারেন। এখন এই পছন্দের শুরুর প্রান্তটা এখান থেকে অনেক দূরে। আমার ধু ধু-করা বাল্যকালের সঙ্গে সে প্রান্তটা শক্ত-করে বাঁধা। সেই যে রূপকথার আলো-আঁধারিতে খুর বাজছে ঘোড়ার, রাজপুত্র চলেছেন ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে, বন-বাদাড় ভেঙ্গে, পাহাড়ের গা ঘেঁষে, রাতের শেষে দিনে, দিনের শেষে রাতে—সেখানেই, সেই সুদূরেই শুরু। ঐ ঘোড়াটাই সবচেয়ে প্রিয় ছিল আমার।

পরবর্তী ঘোড়া কৈশোরের। সে ঘোড়া রূপকথারও নয়, ঘোড়ার গাড়ীরও নয়, ঘোড়া চলচ্চিত্রের। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি রেল লাইনের উপর আড়াআড়ি করে বাঁধা পড়ে আছে সুন্দরী যুবতী নায়িকা। ঘোড়ায় করে এনে তাকে ঐভাবে শুইয়ে রেখে তস্করেরা বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল ত্রস্তে। গেছে কি-যায়-নি এমন সময়—কো-ও-ও, ট্রেন্ আসছে ছুটে। ওদিকে, তখনি দেখা গেল, পাল্লা দিয়ে ছুটছে নায়কের সাদা ঘোড়া। অশ্বপ্রাণ জেতে না ট্রেন? যেন পাগলা সে। ঠক্ ঠক্ ঠক্। ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্। কে জেতে! হায়, হায়, জিতল বুঝি ট্রেনই! নায়িকা কাতরাচ্ছে লাইনের ওপর। কী হয়, কী হয়, পারবে কি অশ্বারোহী! আতঙ্কে প্রায় যখন চোখ বুজে ফেলেছি, তখন হঠাৎ শুনি, সাবাশ! বেঁচে গেছে নায়িকা। পাশ কেটে অন্য লাইন দিয়ে বয়ে গেল ট্রেনটা। আসল

কৃতিত্ব অবশ্য লাইনস্‌ম্যানের, ঠিক সময়ে দৌড়ে এসে সে এই লাইনের মাথাটা জুড়ে দিয়েছিল অন্য লাইনের সঙ্গে। মাত্র পাঁচ হাত জায়গার জন্য রক্ষা পেল রূপসী সে নারী! কৃতিত্ব যারই হোক, ঐ যে ছুটেছিল নায়ক ও তার ঘোড়া, জীবনপণ-ঘোড়দৌড়ের ঐ দুর্যোগসময়ের কয়েকটি চরম মুহূর্তে আমার মনপ্রাণ সেই ঘোড়ার সঙ্গেই লেগে ছিল। সেই লাগাটা দেখছি এখনো ছাড়েনি। ঘোড়াদের এখনো ভাল লাগে আমার। যেন আমি এক অশ্বিনীকুমার।

কুকুর, গরু, ছাগল, হরিণ—এরা সবাই আমাদের কোন না কোন কাজে লাগে। কেউ পাহারা দেয়, কেউ দেয় দুধ, কেউ জোগায় মাংস। কিন্তু ঘোড়া? ঘোড়া কি দেয় আমাদের? কোন উপহার? সে শুধু একটা বস্তুই দিতে জানে—দৌড়।

ঘোড়া মানেই ছোটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি। আর এইজন্যই, এই প্রয়োজনে না-লাগার কারণেই, তাকে আমার বিশেষ পছন্দ। আমাদের রোজকার প্রয়োজনের নোঙরা কাদা ওর গায়ে যেয়ে লাগেনি, সে-মাপে ছাটা নয় তার আচরণ। পুচ্ছ দুলিয়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে সে ছুটছে, কেবলি যেন ছুটছে, চলে যাবে ছোট থেকে বড়র দিকে। এই যাওয়ায় ও এই চাওয়ায়, যে একটা তেজ আছে, আছে এক প্রকারের দর্প ও দীপ্তি, তারা যেমন ঝলকে চলকে ওঠে তেমনটা আর কোথাও দেখি না। রাজহাঁসের কিছুটা আছে, সামান্য একটু মেলে দর্পিত মোরগে, কিন্তু ঘোড়ার পাশে কে দাঁড়াবে? অশ্বের এই রাজকীয় রাজসিকতা আমার মন ভরে দেয় সৌরভে।

কিন্তু শুধু কল্পনাতেই, তার বাইরে আমাদের কাদাপানি ভেজামাটির গরীব দেশে কী এমন দাম আছে ঘোড়ার? বিলাত-ফেরত আমার এক বন্ধুর বক্তৃতা ছিল সেদিন বেতারে, বললেন, "দেখে দাওতো লেখাটা।" লেখার বিস্তর প্রশংসা অনায়াসেই করা গেল। কিন্তু খটকা লাগলো এক জায়গায়। বাচ্চাদের জন্য লেখাঃ বিষয়, বিলাত দেশটা কেমন। লিখেছেন, "নিশ্চয়ই বিলেত সম্পর্কে জানতে চাও তোমরা। কেমন সে দেশের মানুষজন, গাছ-পালা, গরু-ঘোড়া।" খটকাটা এইখানেই। দেখি গরু-ঘোড়া লিখে কেটে দিয়েছেন, পরে লিখেছেন, গরু-ভেড়া,

ঘোড়া বদলে গেছে ভেড়ায়। জিজ্ঞাসু হওয়ার পালা। জিজ্ঞাসা করলেন, "ঘোড়া কথাটা কেমন খারাপ শোনায় না?"

তা শোনায় হয়তো। ভেড়া বোধ হয় ভালোই শোনায়। তার চাষ যদিও দেশে অনেককরে হয় না, তবু গৃহপালিত ভেড়ারা অবশ্যই স্ত্রীদের বিশেষ প্রিয়, আর মাঠের ভেড়ারা থাকতো যদি তবে সময়মতো পশম ও দরকারমতো মাংস সরবরাহ করতে পারত। এমন কি গাধাও আমাদের উপকারে লাগে। বিশেষ করে ধোপাদের। শুনেছি জঁাদরেল শিক্ষক যারা তাঁরা অনেক গাধা পিটিয়ে মানুষ করে থাকেন। কুকুর আমাদের বিপদের বন্ধু। কিন্তু ঘোড়া? দুধমাংসতো দেয়ই না, লোমও নয়। কোনো ঘোড়া যে কখনো মানুষ হয়েছে এমন কথা জানা যায়নি। ওদিকে সে যদি কখনো কোন মানুষের বিশেষ বন্ধু হয়ে পড়ে তা'হলে খোদা সে-মানুষের মঙ্গল করুন।

এই কথাটা আমাদের ঠিকা-ঝি রোজ বলে। ওর ছেলের বাপ ঘোড়ার নীচে পড়েই মারা গেছে। ঘোড়া ঘোড়া করেই মরল লোকটা। বউয়ের শেষ চুরি-বেচা টাকা কয়টা যে রবিবার রেসের মাঠে খুইয়ে এল, সেই রাতেই বিছানায় পড়ল বুড়ো। সেই পড়াই শেষ পড়া, শেষ কালু মিয়ার! ঘোড়ার গাড়ীতে করে পরের শনিবার তাকে আজিমপুরায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তা না হলে এই বয়সে মানুষের বাড়ীতে আজ মসলা পিষে বেড়াতে হয়, দোলয়ার মিয়ার মাকে? রোজ সকালে যখন সে আস্ত আস্ত হলুদ-মরিচ গুঁড়ো করে শিলপাটায় ফেলে নোড়ার উঠতিপড়তির সঙ্গে সমান তালে চলে তার গজর গজর বাক্যলহরী। যেন ঘোড়ারই বিকল্প ঐ মসলাগুলো, হাতে পেলে ঘোড়াগুলোকেই পিষতো সে। রবিবার দিনতো মুখ ও শিলপাটার ধমাধমে রান্নাঘরের সমস্ত এলাকাটাই নিতান্ত বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

তার কারণ আছে, এখন নাকি বাপের বদলে দোলারা মিয়া নিজেই ফি রবিবার ঘোড়-দৌড়ে যাচ্ছে। যাবে না? দোষ হল রক্তের, অশ্বপ্রীতির এই রোগ এ তাদের বংশের। তা বটে, রবিবার সন্ধ্যায় রেসের মাঠে থেকে যে-কাফেলা অবিরাম বেরিয়ে আসে, আসতো এক সময়ে, অনেক

দিন তার মুখোমুখি হয়েছি, দেখেছি গরীব মানুষই বেশী, তখন বুঝেছি গরীবের ঘোড়া রোগ কথাটার তাৎপর্য কি, অর্থ কোনখানে।

সত্যিতো শিশুদের কল্পনা ও বয়স্কদের রোগের বাইরে ঘোড়া কোথায় আছে আমাদের জীবনে? বলতে পারেন, আছে বৈ কি, আছে ঘোড়ার গাড়ীর জোয়ালের নীচে। কিন্তু সে কি একটা থাকা হল? ঘোড়ার মত থাকা বলা চলে কি তাকে? ঘোড়ার উচিত কাজ কি ঘোড়ার গাড়ী টানা?—নয় যে তা তাদের চালকেরা জানতো। যখন খুব কদর ছিল ঐ গাড়ীর, অন্য কোন গাড়ীই ছিল না প্রায়, তখনো ঘোড়াকে ওরা ঘোড়া বলতো না, বলতো পক্ষীরাজ। ছুটুক না-ছুটুক, সে লম্পঝম্প দিতো মেলাই, আর অবুঝ সওয়ারী বেকুফের মত দামাদামি করলে চিঁ হিঁ করে হেসে হত আটখানা। কিন্তু রূপকথাতেই হোক কি ঘোড়ার গাড়ীর নীচেই হোক—পক্ষীরাজ তো আর ঘোড়া নয়, যেমন ট্যাস গরু গরু নয়, আসলেতে পাখি সে। সে পক্ষীই বা কোথায় এখন? কোথায় এখন ঘোড়ার গাড়ী? কালু মিয়ারা এখন বোধ হয় স্কুটার চালায়, গাড়ীর ঘোড়া ধোপার কাজে বেচে দিয়ে।

ঘোড়ার চেয়ে ঘোড়ার ডিমই বরং বেশী জনপ্রিয় মনে হয় আমাদের দেশে। আরো একটা কথা আছে: ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেয়ো না!' কিন্তু এ কথাতে ঘোড়ার খুব একটা প্রশংসা আছে বলতে পারি না। তার চেয়েও বড় আপত্তি ব্যাপারটা অলীক। কোথায় আছে এমন ঘাস ক্ষেত আমাদের এই সবুজ বাংলাদেশে যেখানে ঘোড়ারা চরে বেড়ায়? এইজন্যেই যে-পুঁথিসাহিত্যে আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য, নিরবধিকাল ধরে যার রস রসিকচিত্তে আনন্দের ফল্গুধারা বইয়ে দিতে থাকবে বলে জ্ঞানী লোকেরা দাবি করেন, তার মশহুর শায়ের লিখে গেছেন, "ঘোড়ায় চড়িয়া মরদো হাঁটিয়া চলিল। তেরছা করে দেবেন দাড়ি নয়। কিছু দূর গিয়া মরদো রওয়ানা হইলো।" আমার মনে এক ধরনের রসিকতা, মর্মান্তিক ব্যঙ্গ একপ্রকারের। কবি ঠাট্টা করেছেন হয় এ মরদোকে, খুব তো তড়পাচ্চো বাপু, কিন্তু কত জোরে যাবে তুমি শুনি তোমার ঐ ঘোড়ায় চড়ে, খাল বিল-পানি-কাদার কথা খেয়াল আছে তো? আবার দেখুন আধুনিক কবিদের লেখাতেও দেখেছি আরব

দেশের ঘোড়ার কথা নেই বড় একটা, থাকে যদি তো আছে আরবী খেজুরগাছের কথা। অথচ শুনেছি আমাদের পূর্বপুরুষদের মাত্র ১৭ জনে মিলে যে অবলীলায় এই দেশটা জয় করে নিতে পেরেছিল তার আসল রহস্য ছিল। তাদের ঘোড়ায়, অশ্বারোহী ছিল তারা। ঘোড়ায় চড়ে অতি দ্রুত এসেছিল বলে পরাজিত স্থানীয় লোকেরা তাদের নাম দিতে চেয়েছিল যবন। সেই অশ্বারোহী বীরদের যারা বংশধর শেষটায় তাদের এই হাল? ঘোড়ায় চড়ার মরদামিতে এমন ঘোরতর সন্দেহ!

বোঝা যাচ্ছে ঘোড়া শেষ পর্যন্ত শুধু রূপকথা ও রোগের মধ্যেই টিকে থাকবে। কোনমতে, এমনকি বাংলা সাহিত্যেও ঘোড়া নেই খুব একটা, তার পদধ্বনি ভালো করে কান পেতেও শোনা যায় কি যায় না। চকিতে কখনো আসে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথে, কিন্তু দূরবর্তীই থাকে, নিকটের হয় না, কেবলি পালিয়ে বেড়ায়। বীর অশ্বারোহী তলোয়ার উঁচিয়ে বিপন্না নারীকে পথিমধ্যে উদ্ধার করল এমন কাহিনী দেশী সাহিত্যে কটা পড়েছি আমি? চূড়ান্ত বিদায়ের আগে প্রেমিক-প্রেমিকা শেষ বারের মত যুগলে ছুটন্ত ঘোড়ায় টগ্‌বগিয়ে ছুটছে আর ভাবছে, নাই বা থাকলো ভবিষ্যৎ, কে জানে আজ রাতেই পৃথিবী রসাতলে যাবে কি না, অথবা দেশোন্মাদ ঘোড়সওয়াররা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে বিনাদ্বিধায় ধাবিত হচ্ছে—এমন চিত্র দেখতে হলে বিদেশী কবিতা পাঠ ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমাদের প্রেমিক-প্রেমিকা বড় জোর দোলনায় দোলে, বীরেরা ঘরে এসে দাপাদাপি করেন। কোথায় পাব এমন দৃশ্য যে, ঘোড়া ছুটে এলে দিল তার সওয়ারকে, খোঁড়া করে দিল পায়ে চেপে, বা সেই দৃশ্য যেখানে ঘোড়ারাই রাজা, বাহক নয়, সেরা তারা মানুষের চেয়ে তাই মনুষ তাদের ভৃত্য?

ঘোড়ার মর্যাদা নেই। তা না থাক, এই অমর্যাদাই হয়তো আমাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। আর সেটার দ্বিতীয় কারণ যার জন্য ঘোড়া আমার সবিশেষ প্রিয়।

ভ্রমণে

ধরা যাক আপনি ভ্রমণে যাচ্ছেন। অনেক বছর পরে। উঠবেন দূরের এক শহরে এক নিকট-আত্মীয়ের বাড়িতে।

এর জন্য বিস্তর কাঠ-খড় পুড়েছে। গঞ্জনা ঘটেছে। মনকষাকষি ততোধিক। চিঠিপত্র এ-শহর ও-শহর করেছে। বাঁধাছাঁদা, বিধিব্যবস্থা সব ঠিকঠাক। দরজার সামনে সারি সারি রিক্সা দাঁড়িয়ে। সদর দরজার তালা আঁটছেন শক্ত হাতে, এমন সময় দেখেন চাবি নেই পকেটে। অতএব আবার ঢোকা। খোঁজাখুঁজি। খোলাখুলি। কিন্তু নেই তো নেই-ই। রিক্সাওয়ালারা ঘণ্টা বাজাচ্ছে। বাচ্চারা চেপে বসেছিল, তারা হৈ হৈ করছে। গৃহিনী কথা বলছেন না। বললেই বরং ভালো ছিল। চাবি আর পাওয়াই গেল না।

আপদ-বিপদে প্রতিবেশীরাই সহায়। কিন্তু তালা কেউ দিতে পারলেন না। কারুবটায় জং ধরে গেছে। কারুরটা এত ছোট যে, নেয়া না-নেয়া সমান। ট্রেন বোধ হয় ফেলই হল। "তালা আছে ঠিকই, কিন্তু দেবে না। হিংসুকগুলোকে চিনি না।" —অতক্ষণে আপনার স্ত্রীর মন্তব্য। এক ভীষণ বিপদের মধ্যেও চমকে উঠলেন শুনে—শুধু ঝগড়াটাই চোখে পড়েছে এতকাল, ভেতরে ভেতরে স্বামী-স্ত্রীর চিন্তাধারায় এমন যে গভীর ঐক্য সেতো জানতেন না। শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করলেন একজন, হায়দার আলী উদারহৃদয়। নতুন এসেছেন এই পাড়ায়, আপনার এমন কিছু খাতির নয়। প্রায় গায়ে পড়েই এনে দিলেন তালা। জুৎসই ধরনের। মহৎ লোক আজো আছে দুনিয়ায়। সেইজন্যই বুঝি চন্দ্রসূর্য আজো ওঠে।

কাফেলা ছুটলো ষ্টেশনের দিকে।

ঐ অচল অবস্থায় চকিতে সন্দেহ মাথা নাড়া দিয়ে উঠতে চাইল আপনার ভেতর।

ঠিক মত লেগেছে তো তালাটা? টেনে তো দেখেন নি! কে জানে? কিন্তু বিশ্বাসের একটা শক্ত ঘা দিয়ে বেয়াদপ সন্দেহটাকে দিলেন দাবিয়ে। হঠাৎ স্ত্রী'র জিজ্ঞাসা—"তালাটা টেনে দেখেছিলে তো ঠিকমত?" আবার সেই ঐক্য। কিন্তু শুধু বিশ্বাস নয়, ভীষণ উদ্বেগও জমেছে আপনার মনে। ঠিকমত পৌঁছবে তো রিক্সা? ওঠানো যাবে তো লটবহর? তালার কথা ভুলেই গেলেন।

কষ্ট হল। ঠেলাধাক্কা, ধমাধমকি. উটল। তবু ওঠা গেল ট্রেনে। এমনকি বসবার মত অল্প একটু জায়গাও মিলেছে। নিশ্চিন্তে আপনি কাঁধের ঘাম মুছলেন রুমাল বের করে। ভিখিরীরা উঠেছে। খঞ্জমত একজন গান ধরেছে। অন্ধ একজন পেতেছে হাত। ধাকরে অন্য এক ভিখারীর চেহারা এসে সটান দাঁড়াল আপনার চোখের সামনে। এই লোকটা দরজার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, সেই সময়ে যখন তালা নিয়ে ঐ হুলস্থূল চলছিল আপনাদের মধ্যে। আপনি প্রায় হুঙ্কার দিয়ে মাফ চেয়েছিলেন। কিন্তু সে বোধ হয় দাঁড়িয়েছিল নিষ্পলক, নইলে আপনার ছেলে অমন করে ধমকে উঠবে কেন? "এই, কি দেখছ? যাও, যাও, ভাগ!" লোকটা সবটা ব্যাপার দেখেছে নিশ্চয়ই, কে জানে রাতের অন্ধকারে তালাভাঙ্গার যন্ত্রপাতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে কি না দরজার ওপর! প্রতিবেশীদের ভাবসাব তো সবই জানা, বাধা দেয়া দূরের কথা, পারলে হাতুরী কি সাবল এগিয়ে দেবে চুপি চুপি।—হাসলেন। কি সব ভাবছেন আপনি? ছেলেমানুষি!

বুঝি চোখ দু'টো লেগে এসেছিল। ঘুম ভাঙ্গল এক জাদরেল মহিলার কণ্ঠস্বরে। তিনি তাঁর নিজস্ব জিরজিরে স্বামীটিকে ধমকাচ্ছেন,. "দেখতো ঠিকমত লেগেছে কিনা স্যুটকেসের তালাটা!" সবাই দেখল, আপনিও দেখলেন, নিতান্তই দুর্বল সেই তালা। "নৈতিক বল দেয় মাত্র।"

মনে মনে বললেন, হাসি-হাসি ভাব করে। বেশ সতর্ক পরিবার। শোনা গেল স্বামী পাল্টা বলছেন স্ত্রীকে—"দ্বিতীয় চাবিটা তোমার ব্যাগে আছে তো?"

কি কথায় কি হল। শিউরে উঠলেন আপনি। তাইতো দ্বিতীয় একটা চাবি থাকবার কথা তো, আপনার সদর-দরজার ঐ তালার। সেটা নিশ্চয়ই আছে উদারহৃদয় ঐ দাতা ভদ্রলোকের ঘরে। যদি—! না না, ছিঃ ছিঃ, একি ভাবছি! লজ্জায় রাঙা হলেন। বিশ্রী সন্দেহটাকে গলাধাক্কা করে দিলে ঠেলে ফেলে মনের বাইরে। কিন্তু ভীষণ বেয়াড়া সে। ঘুরে ফিরে বার বার বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। জোরে জোরে। বর্ধমান স্রোতে।

গল্প-সল্প চলছে ট্রেন চলার তালে তালে। "যা দিনকাল পড়েছে ভাই আমি তো একেবারে নিজের লোককেও বিশ্বাস করি না!" বলছেন একজন, নতুন আগন্তুক, যিনি চেপে বসে আছেন নিজের সুটকেসের উপর। আর কথা নেই, এই ফাঁক যে ছিল একটু তারই মধ্য দিয়ে সন্দেহটা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল সব-সাবধানতা ভেঙ্গে দিয়ে। জল-জ্যান্ত দেখতে পেলেন হায়দার আলী সাহেব তালা খুলছেন—ঐ দ্বিতীয় চাবি দিয়ে। না, না, সে কি হয় নাকি? কী লজ্জা! কী লজ্জা! কিন্তু হায়দার সাহেবের লজ্জা আছে তো? কেন দিলেন চাবি তিনি অমন গায়ে পড়ে? কেমন লোক তা কে জানে!

কেমন লোক সেটা জানতে চাইলেন স্ত্রীর কাছে। ফিস্‌ফিসিয়ে। কে? কে? করে প্রথমেই সজাগ করে দিলেন তিনি কামরাশুদ্ধ লোককে। দোষ দেওয়া যায় না—বোধ হয় যে-ষ্টেশন থেকে ছোটবোনের জন্য আম কিনবেন ঠিক করে রেখেছেন সেটা পেরিয়ে গেল কিনা তা নিয়ে উদ্বিগ্নচিত্ত ছিলেন। কিন্তু জবাব যা দিলেন সেটা ভেবে-চিন্তে। আপনাকে তো চেনেন, নিজের স্ত্রী পরপুরুষের প্রশংসা করলে ভীষণ চটে যান আপনি। তাই বললেন, 'বিশেষ সুবিধার লোক নয় বলেই শুনেছি।' আপনার বাচাল ছেলেটা কান খাড়া করেই ছিল, বলল—"জানো না আব্বা, ওঁর তো চাকরি গেছে ঘুষ-খাওয়ায়, সেই জন্যই তো বাসায় বসে থাকেন চব্বিশ ঘণ্টা।" বোধ হয় মা'র

মত হলেও চাইল আপনাকে খুশি করতে—এত খরচ-পাতি করেছেন ভ্রমণের ব্যাপারে।

ভিতরের সন্দেহটা তখন একেবারে হা-হা করে হাসছে। আপনি দুলতে-দুলতে অনেক কিছুই আরো স্পষ্ট করে দেখতে পেলেন। কেমন করে তালা খুলছেন তিনি নিশ্চিন্তে! তারপর ভিতরে ঢুকে সারা-জীবনের শ্রমে তিলে তিলে যা জমিয়েছেন আপনি—টাকা-পয়সা, সোনা-দানা যা যা যতটুকু আছে—সব ভরে নিচ্ছেন হা-করা মস্ত এক থলিতে। পরে দেখেন দিব্যি বাজারে যাচ্ছেন তিনি, আপনারই সঙ্গে, আপনার রিক্সাতে চড়েই। যে-মাছটা আপনি কিনবেন-কি কিনবেন-না করছিলেন সেটা আঙুলের এক ইশারায় তুলে নিচ্ছেন নিজের ব্যাগে, যে-তরকারির দাম নিয়ে আপনি মুলামুলি করছেন সেটা অনায়াসে নিয়ে নিলেন ঝন্ ঝন্ টাকা ফেলে দিয়ে। আপনারই টাকা। আপনি শুধু দেখছেন। কাউকে বলতেও পারছেন না। এমন কি নিজের স্ত্রীকেও নয়। বলতে গেলে তিনি তেড়ে আসবেন লাঠি নিয়ে। "তোমার জন্যই তো, তোমার জন্যই তো আমার সব গেল।" পরে আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সেই অতি-পুরাতন কান্না।

না হয় ধরে নেয়া গেল, ভদ্রলোক সত্যি সত্যিই ভদ্র। সজ্জন অতিশয়। কিন্তু তার ছেলে? শ্রীমানকে দু'য়েকবার যা দেখেছেন তাতে আর যা-ই হোক সুবোধ-শান্ত বালকটি বলে ধারণা হয়নি। সে-শ্রীমান তার ভুলফিনার ইয়ারদের নিয়ে যোচ্ছল বসায় যদি লুঠ-তরাজের? নাকি সে অস্ত্রশস্ত্র রাখে প্রচুর। আপনি ঘেমে উঠলেন, বাইরের ঘামটা তাও মোছা গেল, কিন্তু ভেতরেরটা? কেমন স্যাঁতসেতে কাদাকাদা ঠেকছে সমস্ত কিছু।

একটা প্রশ্ন মনের ভিতর আকুলি-বিকুলি করছিল। কিন্তু মওকা নেই যে জিজ্ঞাসা করেন। শেষ পর্যন্ত শ্যালিকার বাসায় পৌঁছে গভীর রাতে স্ত্রীকে যখন নিভৃতে পেলেন কোনমতে, তখন পাড়লেন প্রশ্নটা। "কতটা গয়না এনেছো সঙ্গে?"

স্ত্রী হয়তো অন্য কোন প্রসঙ্গ প্রত্যাশা করছিলেন, প্রশ্ন শুনে জ্বলে উঠলেন একেবারে দপ্ করে। "হয়েছে, হয়েছে এত চিন্তা করতে হবে না

তোমার। সব গয়না রেখে এসেছি বাড়ীতে। আমার বোনকে কিছু দিয়ে যাবো না লুকিয়ে। ভয় নেই, ভয় নেই। শুনে বুক উঠল কেঁপে। তাহলে জীবনের ধন সবই গেল। এই তো ছিল পুঁজি। কিছু গয়না দর কষাকষি করে আদায় করতে হয়েছে কৃপণ শ্বশুরের কাছ থেকে, বাকিটা এক এক পয়সা করে জমিয়ে-কেনা। সদ্যবিবাহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার গয়নাপত্রগুলোও গচ্ছিত রাখা আছে আপনার কাছেই। "টাকা কড়ি কেমন এনেছ?" এত ভয় পেয়ে গেছেন যে অন্য সব ভয় কেটে গেছে আপনার। জবাবে স্ত্রী এমন গোলযোগের সৃষ্টি করলেন যে আর একটু হলেই ভিড় জমেছিল আর কি! আপনি তাঁকে সন্দেহ করেছেন, কিন্তু তাঁরা অত-ছোট লোক নন যে টাকা আনবেন লুকিয়ে! তাঁর বোন কিপ্‌টে নয়, দরিদ্র তো নয়ই। বাড়ি-ঘরের টাকা সব তোলা আছে ঘরেই। গেলেই পাবেন। শুনে আপনার দ্বিগুণ জ্বালা, ততোধিক অসোয়াস্তি।

হায়, কেউ বুঝল না আপনার ব্যথা।

আশা করা গিয়াছিল যে সময়ই সারিয়ে দেবে, কিন্তু কই, সময় যত যাচ্ছে আপনার সন্দেহ তত বাড়ছে। আপনার শ্যালিকা রঙ্গরস করে বললেন একদিন, খাবার সময়টাতে—"দুলা ভাইয়ের মনটা ঠিক এখানে নেই।" "ঠিক বলেছ বোন—" এই পর্যন্ত বলতে পেরেছিলেন তারপর আর রা সরল না, দেখেন স্ত্রী উঠেছেন একেবারে লাফিয়ে।

এরই মধ্যে একদিন দুঃস্বপ্ন দেখলেন রাত্রে। তালা খোলার দৃশ্য। লোকটা কে অন্ধকারে তা ঠিক ঠাহর করা গেল না। বাপও হতে পারে, ছেলেও। কিন্তু লোকটার হাসিটা দেখতে পেলেন। পরের রাতে চোখ বন্ধ হয়ে এসেছে, এমন সময় খুট্‌ করে শব্দ। তালা খোলার। তারপরে ঘুম তো আর আসে না। চোখ বন্ধ করলেই ঐ শব্দ। আপনার মনে এই রকমের দর্শনের উদয় হল যে, ঘুমানো মানেই চেতনার দরজায় তালা দেওয়া। অথচ আপনার নিজের তালা লাগছে না, যত ধস্তাধস্তি করছেন তত বেশী বিকল হয়ে পড়ছে। জেগে জেগে দেখলেন হাজারে হাজার মানুষ চাবি, হাতুড়ি, শাবল যে যা

পেয়েছে নিয়ে উন্মত্তের মত তালা খুলতে ছুটছে। তালা দেয়ার চাইতে তালা খোলাতেই উৎসাহ বেশী।

সাতদিন থাকবার কথা ছিল। তিন দিনের মাথায় সবাইকে ঠেলে-ধাক্কিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে ফেরত এলেন।

এসে দেখেন তালা ঝুলছে ঠিকই। কিন্তু হয়ত ভেতরের মালমাত্তা সব সরিয়ে, সাফ করে দিয়ে প্রতারক তালা ঝুলিয়ে রেখেছে দরজায়। কাঁপতে কাঁপতে ঢুকিয়ে দেখেন কোন ভুল নাই, সন্দেহ ঠিক, চাবি ঘোরেনা.. ঘোরেনা চাবি কিছুতেই। ছোট, ছোট, সেই হায়দার আলীর বাসায়। "দ্বিতীয় চাবিটা দিন।" কোন ভূমিকা নেই, বাহুল্য নেই, ভদ্রতা নেই, সরাসরি দাবী করলেন, একেবারে সামনাসামনি।

"দ্বিতীয় চাবি নেইতো।"

হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।

কিন্তু ভদ্রলোক নিজেই এলেন আপনার সঙ্গে, আপনার কাছ থেকে চাবি নিয়ে তালা খুলে ফেললেন এক নিমেষে। নাকি ভুল চাবি আপনি লাগিয়েছিলেন। ধস্তাধস্তি করছিলেন অনর্থক। সে কী হাসাহাসি সকলের।

না, সবই আছে, ঠিকঠাক আছে। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘাম মুছলেন। আর ঠিক করলেন এর পরের বার ভ্রমণে বার হবার আগে যত দামই হোক একটা তালা অবশ্য অবশ্য কিনবেন ভীষণ মজবুত। না, আজই। আজই কিনবেন। রাখবেন সেটাকে অত্যন্ত যত্ন করে।

কাছের মানুষ

কাছের মানুষতো বটেই। যেতে-আসতে, চলন্ত বাস থেকে, কিম্বা খোলা জানালার পথ দিয়ে রাজমিস্ত্রীকে কে দেখিনি, কে দেখছিনা। এখন বরং বেশী করেই দেখছি। এই যে আমাদের চতুর্দিকে একটা হৈ হৈ পড়িতো-মরি ব্যস্ততা অহরহ চলছে—তৈরী কর, বানিয়ে তোল, এই মহৎ চলচ্চিত্রের মধ্যে রাজমিস্ত্রী একজন সর্বত্র-উপস্থিত চরিত্র, বড় ছবির মধ্যে একটা স্থায়ী টুকরো ছবি। কখনো বসে কখনো দাঁড়িয়ে সে গেঁথে তুলছে। মাটির থেকেও নীচে তাকে দেখেছি, আবার দেখছি বাঁশ বেয়ে বেয়ে উঠে গেছে, উঁচু গাছের চেয়েও উঁচুতে। মানুষের মাথায় চড়ে আসছে ইট, মাখানো সিমেন্ট। মিস্ত্রী সিমেন্ট তুলে নিল, সেই ছোট্ট হাতিয়ারটা দিয়ে, যার নাম কনে। ইটেরা বসে গেল একের পর এক। সমান হলতো? দেখতে হলো দড়ি টানিয়ে, সুতো ঝুলিয়ে। সমান করার জন্য ইট কাটছে টুক্ করে—বারসোলা দিয়ে। পলেস্তারা পড়েছে। পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। ঘসে সমান করছে গজ দিয়ে।

কাছের মানুষতো বটেই। গলির মুখে দেখেছি. দেখেছি আছে পথের সরু পাশটিতে, এমন জায়গা দেখেছি যেখানে চারপাশে তাকাও মানুষ বলতে শুধু দেখা যাচ্ছে রাজমিস্ত্রী। স্তূপ-করা সরঞ্জাম ও আয়োজনের মধ্যে ঠুক্ ঠুক্ কাজ করছে। যেন নিসর্গেরই অংশ। “বড় ভালো লাগে দেখতে,” এক পরিচিত লোক বলেছিলেন, “যেন কেকের মধ্যে বিক্ষিপ্ত কিসমিস।”

কিন্তু কত কাছের মানুষ? ততটাতো নয় কখনো, যতটা কাঠের মিস্ত্রী, পানির কলের, কি বিজলী বাতির। তেমন কাছের নয় যেমন কাছের দর্জি কি ক্ষৌরকার, রিক্সাওয়ালা অথবা পানওয়ালা।

কাঠের মিস্ত্রী যখন কাজ করছে তখন সে-খবরটা কারো অজানা থাকবার উপায় নেই। তার কাজ মানেই শব্দ। কিন্তু রাজমিস্ত্রীর ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্ কানে পড়ে কই! তার চারপাশে অনবরত শব্দ চলছে, সেই শব্দকে ছাপিয়ে ওঠে না তার ব্যস্ততার জয়ধ্বনি। রাজমিস্ত্রীকে আমরা দেখি, শুনি না। আর দেখি যে সেও দূর থেকে। সে কাছে আসে না। সে আমার ঘরের ভেতর আসে না, যেমন আসে কাঠের মিস্ত্রী, কলের বা বিজলী-বাতির। তার কাজতো বাইরে বাইরে। আমি যখন ঘরে এলাম, সে তখন ঘর তৈরী করে দিয়ে অন্যত্র গেছে চলে। তার তুলনায় যে-দর্জি আমার কাপড় তৈরী করে সে তো রীতিমত ইয়ার একজন—কথা বলে গায়ে হাত দিয়ে, মাপ নেবার অজুহাতে। ক্ষৌরকার সে তো আরো বেশী ঘনিষ্ঠ। সংলগ্ন গালের সঙ্গে।

আমাদের কজনেই-বা নিজের ঘরে থাকি—নিজের টাকায় তৈরী ঘরে—যে ঐ ঘর-তৈরীর কাজের মধ্য দিয়ে রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হব? কাঠের মিস্ত্রী আমার হয়ে—একান্তই আমার হয়ে কাজ করে। সে টেবিল তৈরী করে দিল আমার জন্য, আমারই জন্য—যে-টেবিল অন্য বাড়িতে গেলে সঙ্গে নিয়ে যাব টেনে, এ-বাড়িতে যতদিন আছি ব্যবহার করছি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে। কিন্তু এ-বাড়িটা যদি এমন-কি আমারই হোত, আমার নিজস্ব, তাহলেও কি বাড়িটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতাম অন্যশহরে বদলি হলে? তাছাড়া এ-বাড়িও তো সে একা তৈরী করেনি। সঙ্গে আরো অনেকে খেটেছে, অনেক রাজমিস্ত্রী, যোগানদার, ঠিকাদার, কাঠের মিস্ত্রী, লোহার দোকানী। এমন-কি যদি আমার নিজের কাজেও লাগাই রাজমিস্ত্রী তবু সে ঘনিষ্ঠ হবে না, দূরে দূরেই থাকবে। রোজ যদি তদারক করি দু'বেলা নিজে এসে, তাহলেও না। তাহলেও দেখব সকালে যেখানে বসে কাজ করছিল, সন্ধ্যায় আর সেখানটাতে নেই। চলে গেছে, সরে গেছে। আর তাকে আনব যে ডেকে তাও আনতে হবে বিস্তর সাধ্যসাধনা করে। টাকা লাগবে দেদার, জমিন চাই, চাই ইট, সিমেণ্ট, বালু। সমস্ত-কিছু যোগাড় করে তবে তার কাছে যাব যদি তাকে ধরা যায়। তারপরেও হয়ত তার সঙ্গে সরাসরি কথা হবে না, হবে ঠিকাদারের সঙ্গে,

অথবা অনেক রাজমিস্ত্রীর মধ্যে একজনের সঙ্গে। দর-দাম, কোলাকুলি চলবেনা, যেমন কি-না অনায়াসে চলে রিক্সাওয়ালা কি তরকারিওয়ালার সঙ্গে।

যতক্ষণ কাজ করছে রাজমিস্ত্রী ততক্ষণ সে রাজার মতই নির্বিকার, নিরাসক্ত—যেন আদর্শ রাজার বিশ্বস্ত প্রতিমূর্তি। তার চেহারায় চাঞ্চল্য নেই। বরং যে-লোক নীচে বসে তার কাজ দেখছে—ঠিকাদার বা মালিকের কর্মচারী—তার মনেই উদ্বেগ বেশী, আর ক'দিন লাগে, বৃষ্টি এসে ধুয়ে নিয়ে যায় নাকি ঢালাই, এই সিমেণ্টে কাজ সারবে তো? না, রাজমিস্ত্রীর কাজে কোন চাঞ্চল্য নেই—তুলনায় তার হাতের ইটগুলো বরং অধিক চঞ্চল। ঐ যে কাজ করছে তখন তার মনের ভেতর কি কি কথার চলাফেরা তা আমি কি করে জানব? সে কি গান করে গুন গুনিয়ে? আমরা শুনতে পাইনা। মাঝি নয় সে নৌকার, যে গাইবে কোন ভাটিয়ালি। তাকে কথা বলতে শুনিনা অন্যের সঙ্গে। নিজের ঘরে চাল নেই—অন্যের জন্য রাজবাড়ি বানাচ্ছি—এই রকম কোন ভাবনা এসে দীর্ঘশ্বাস তৈরী করে দেয় কিনা তাই বা কি করে জানব, সেই তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে সিমেণ্ট শুকোয় কিনা তাও বলার উপায় নেই। নাকি তার হাসি পায় পরোপকার করছে এমন কথা ভেবে? সে-হাসি আমরা পাই না দেখতে, হতে পারে ইটেরা দেখে। নীরবে।

সেটা অবশ্যি একবার দেখেছিলেন আমার এক আত্মীয়। হিসাব করছিলেন রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে। "এত টাকা লাগবে!" তার এই বিস্ময়োক্তি শুনে রাজমিস্ত্রীর ছোট্ট একফালি হাসি। বিদ্যুৎপাতের মত। সে-হাসিতে কি ছিল তিনি বলতে পারবেন না। ঠাট্টা? কৌতুক? নাকি অনুকম্পা—যেমন ফোটে রাজার হাসিতে, অবোধ-প্রজার কথা শুনলে? যাই থাকুক পরে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে চমকে উঠেছিলেন তিনি। নিজেকে অত্যন্ত খাটো মনে হয়েছিল তাঁর। যেন খঞ্জ চলেছেন গিরিলঙ্ঘনে।

ঐ যে আমরা রাজমিস্ত্রীকে রাজমিস্ত্রী বলি ঐ-বলাটা বোধ হয় দূরত্বেরই চিহ্ন। নয়ত বলি ওস্তাগার, মর্যাদা দেই ওস্তাদের। যেসব আঞ্জাম, সরঞ্জাম নিয়ে তার কাজ, তারাও রাজকীয়, ওস্তাদ মাল তারা,—আমাদের কাদা-

পানি, জলামাটির পটভূমিতে। আমাদের পাথর নেই, ইটই আমাদের পাথর। ইটের শিল্পী পাথরেরই শিল্পী।

কিন্তু তাকে শিল্পী বলব, নাকি শ্রমিক? অন্য-মিস্ত্রীর মত তার স্বাধীনতা নেই। সে বলতে পারবে না এই কাজটা আমার করা, আমার নিজের হাতের। এমন সময় ছিল যখন ছোটখাটো বাড়ির নক্সা রাজমিস্ত্রীর বুদ্ধিতে জমা থাকত, টাকা ও জায়গার পরিমাণ জানিয়ে দিলে বাড়ির চেহারা ছবি দিয়ে দিতে পারত ঠিক করে, যে-বাড়ির দরজায় চাঁদতারা ও নিশান থাকত আঁকা, যার নাম হত মালিকের নিজের কিংবা তার প্রিয় ভার্যার নামে। কিন্তু এখনতো সে সময় আর নেই, এখানকার রাজমিস্ত্রী বন্দী হয়েছে বড় নক্সার ছোট এলাকায়। কিন্তু তবু তাকে কি শ্রমিক বলা যায়? সে তো কাজ করে না কারখানায়।

ভুঁইফোঁড় কথাটার সঙ্গে যদি একটা বিতৃষ্ণা জড়িত না-থাকত, না-থাকত এক ধরনের খারাপ অর্থ তাহলে রাজমিস্ত্রীকে বলতাম ভুঁইফোঁড়। যে-অর্থে গাছও ভুঁইফোঁড়। রাজমিস্ত্রীর কাজ মাটিকে ফুঁড়ে উপরে ওঠে। উপরে, আরো উপরে। তারো উপরে। তার চোখ সব সময়ই উপরমুখো। তাছাড়া দালানকোঠা জিনিস আমাদের দেশে খুবই হালের ঘটনা। এ-দেশের রাজাবাদশারা বড় বড় দালান তৈরী করে রেখে যাননি। এমন-কি তামার পাতে-লেখা জমিদারী আছে এমন বংশেরও দেখেছি দালান নেই বাড়িতে, একটা ভাঙা ইটও নেই অবশিষ্ট। শিল্পটা তাই রাজকীয় বটে, কিন্তু খুবই নাবালক সে বয়সে। সেটা ওর যন্ত্রপাতির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। ভীষণ সাধারণ, নিরীহ, প্রায় অকিঞ্চিৎকর। এই শিল্পে বাহু-বলই প্রধান বল। বিলেতী কনে বলে যে জিনিসটা দেখলাম রাজমিস্ত্রীর ব্যস্ত হাতে সেটাও এমন কিছু বিপুল বস্তু নয়—নিতান্তই সামান্য।

এই রাজার রাজত্ব আবহাওয়ার করতলগত। আবহাওয়ার কথা চিন্তা করেই নাকি রাজাবাদশারা দালানকোঠা বানাতে তেমন গা করেননি। আবহাওয়া এখনো রাজমিস্ত্রীর বড় শত্রু। তার মাথার ছাতা কি গামছা রোদ বৃষ্টির প্রখরতার মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট নয়। পর্যাপ্ত

নয় আদৌ। রোদ তবু সহ্য হয়, কিন্তু যখন বৃষ্টি এল ঝমঝমিয়ে, পানি উঠল জমিনে, শ্যাওলা পড়ল ইটে, পাথর হয়ে জমে গেল সিমেণ্ট তখন আর দালান বানায় কে? তার চেয়েও বড় আবহাওয়া আছে—অর্থনীতির হাওয়া, জিনিসপত্রের উঠতি-পড়তির ছন্দধারা, যার সঙ্গে তাল দিতে হয় দালান-কোঠাকে, যার তালে তাল দিয়ে রাজমিস্ত্রীর ব্যস্ততা বাড়ে, অথবা কমে।

রাজমিস্ত্রী যে রাজার রাজা, আদর্শ-রাজা সেটা শুধু কাজের সময় নয়, যখন সে নেমে আসে নীচে তখনও। তখন সে উপকথার রাজার মত মিশে গেছে প্রজাদের ভিড়ে। যখন সে চলছে পথে তখন তাকে চিনব কি করে? পরনের লুঙি বা ময়লা সার্ট সে তো অতি-পরিচিত সর্বজনভূষণ। কাঠের মিস্ত্রীকে চিনতে পারি তার কাঁধের বাক্স দেখে, কিন্তু রাজমিস্ত্রীর থলেতে তার নিরীহ যন্ত্রপাতিগুলো আছে নাকি আছে শেষ-বাজারের তরকারী, অথবা পাটাখোদাই করবার হাতিয়ার—সে আমি জানব কেমন করে? মাথার লাল গামছা খুলে সে যখন মাছ কিনে ফিরেছে ঘরে তখন সে-তো নৌকার মাঝিও হতে পারে, অথবা ছোট দোকানদার, বা ঐ রাজমিস্ত্রীরই যোগানদার একজন।

না, তার গায়ে, পোশাকে কি কাঁধে কোন চিহ্ন নেই আঁটা। ছোপ নেই, ছাপ নেই। কাজের বাইরে, লোকের ভিড়ে, সে আর পাঁচজনেরই একজন। আর তখনই—যখন সে চলতি-পথে অন্যের জন্য ধাক্কা খেল না আমার সঙ্গে—তখনই বোধ হয় সে আপন আমাদের! অনেক আপন।

কলেজে যাওয়ার পর

হঠাৎ অসুস্থ বোধ করায় আগে-ভাগে বাসায় ফিরে আজমল আলী সাহেব যখন দেখলেন তাঁর স্ত্রী ফেরিওয়ালার কাছে চাল তুলে দিয়ে চুড়ি কিনছেন, তখন দুনিয়াটা তাঁর জন্য রীতিমত টলে উঠল। এত কাছাকাছি আছেন, অথচ খবর রাখেননি! না-হয় চাল গেল, ক্ষুদ নয় আস্ত-আস্ত চালই পাচার হয়ে চলে গেল, হয়ত অনেকদিন ধরেই যাচ্ছিল। এটা না-হয় সহ্য করা গেল, কঠিন সহ্য করা তবু গেল। কিন্তু তিনি কি জানেন তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে ঐ আপাত-শান্ত নিতান্ত নিরপরাধ বলে-স্বীকৃত স্ত্রী আর কি কি, কোন কোন রোমহর্ষক কার্যে লিপ্ত হন? সাহিত্য ও অপরাধশাস্ত্র দুই-ই এক সঙ্গে আজমল আলী সাহেবের দখলে ছিল। অনেক সন্দেহ একের পর এক প্রজ্বলিত হয়ে উঠল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে। ঠিক করলেন আর কালবিলম্ব নয়, স্ত্রীকে কাজ দেবেন, ভর্তি করে দেবেন কলেজে। কোন কাজ কর্ম নেই, গ্রীষ্মের লম্বা দুপুরে অখণ্ড অবসর, স্বামী আপিসে, ছেলেমেয়েরা স্কুলে, গৃহভৃত্য আড্ডায়—এই সুযোগে সাহিত্য ও অপরাধশাস্ত্রে অনেক বড় বড় অঘটন অনায়াসে ঘটে গেছে। আজমল আলী সাহেবের গা কাঁটা দিয়ে উঠল্। না, কলেজ ছাড়া গত্যন্তর নেই।—ভাগ্যিস, তিনি অসুস্থ হয়েছিলেন।

সিদ্ধান্তের কথা শুনে অফিসার্স ক্লাবে অনেকেই হৈ হৈ করলেন। বলে কি! বাড়তি বয়সে উঠতি রোগ। "খাল কেটে কুমীর আনবেন না"—একজন বললেন, বিজ্ঞের হাসি হেসে, ভদ্রলোকের অল্প বয়স। অনেকেই অনেক রকম ভয় দেখালেন। তিনি নিজেও কিছু কম জানতেন না। সাহিত্য ও অপরাধশাস্ত্র তাঁর নখদর্পণে।

কিসের জন্য ভর্তি করছেন? —এক ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক জানতে চাইলেন। "স্ত্রীকে দিয়ে কি চাকরি করাবেন নাকি?" এ কথাটা খুব আহত করল আজমল আলীকে। তিনি লোভী—এমন অভিযোগ কেউ করতে পারবে না। বরং ঐ তো সে-বার যখন এক টাকা দিলে তিন টাকা পাওয়া যাবে এরকম একটা হট্টগোল শহরময় ছড়িয়ে গিয়েছিল, তখন সংযত ছিলেন শুধু একজন। আজমল সাহেব। সকলে হেসেছিল। মাস না-ঘুরতেই আজমহল আলী সাহেব হাসার সুযোগ পেলেন। তবে জোরে নয়, মুচকি। এমনকি এ-ব্যাপারেও তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন।

স্ত্রীকে খাটানো দূরের কথ, স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্যেই তিনি কলেজে দিলেন। একরকম জোর করেই বলতে গেলে। পরে দেখেন হাওয়া ঘুরে গেছে বাড়ির। যেন অনেক অনেক দিন পরে বন্ধ দরজা-জানালা একসঙ্গে খুলেছে অনেকগুলো। বই-পত্র, খাতা-কলম কলেজের গল্পগুজব সব মিলিয়ে ভীষণ ভালো লাগছে নতুন দাম্পত্য জীবন। হয়ত কোনদিন ভাত ফুটছে না ঠিক মত, কোনদিন ভাত ঠাণ্ডা পাথরকুচি হয়ে থাকছে—কিন্তু খুব ফুর্তি লাগছে খেতে, যেন একটা অবিরাম চড়ুইভাতি। বিচারে তাঁর ভুল হয়নি।

একদিন বিকেলে দেখেন স্ত্রী বেরিয়ে যাচ্ছেন তড়িঘড়ি। ভাবলেন কোন ফাংশন হয়ত আছে কলেজে। সে তো থাকবেই। খবরের কাগজের আড়ালে আত্মসন্তুষ্ট একটা হাসি ছড়িয়ে দিলেন আজমল আলী। স্ত্রীর এই বিশেষ গুণটা আগে লক্ষ্য করেননি—এই মানিয়ে নেয়াটা, বয়স কমিয়ে পুরাপুরি ছাত্রী হয়ে যাওয়াটা। সন্ধ্যার দিকে স্ত্রী ফিরলেন। একেবারে আহ্লাদে আটখানা। এত খুশী! ব্যাপার কি? "মিষ্টি খাওয়াতে হবে"—স্ত্রীর খুশি আর থামে না। "কেন, কি ব্যাপার?"

"ঐ যে তোমার প্রমোশন, এত কালে তার হিল্লে হল।" আজমল সাহেব অত্যন্ত বিভ্রান্ত বোধ করলেন। কি করে জানলেন তাঁর স্ত্রী চিঠি কি বাসায় দিয়ে গেছে? নাকি টেলিগ্রাম?

না, জেনেছেন অন্য উপায়ে। হাত দেখিয়ে। শরীফা বেগমের হাত দেখেই গণক বলে দিয়েছেন স্বামীর আশু পদোন্নতির কথা। নিশানাটা নাকি নির্ভুল। বৃত্তান্ত এই যে, শরীফা বেগম ঐখানেই গিয়েছিলেন আজ

বিকেলে, ষ্টুডেন্টস্ কনসেশনে হাত দেখাতে। স্থানীয় এক আপিসের কর্মচারী একজন নতুন এসেছেন, তিনিই দেখছেন হাত। —কোথায় পেলে সন্ধান? কেন, ভদ্রলোকের স্ত্রীও তো কলেজে পড়েন। একদিন জানা গেল ছাত্রীদের জন্য অর্ধেক টাকায়—পাঁচসিকাতে—হাত দেখবেন তিনি। হাত যে দেখেন সে খবরটাও প্রকাশ পেল তখুনি। তাবিজের জন্য অবশ্যি আলাদা-আলাদা চার্জ। সেখানে কনসেশন নেই।

"তাবিজও নিয়েছ নাকি?"—ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন আজমল সাহেব।

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"কেন আবার। পল্টু ম্যাট্রিকুলেট দিচ্ছে না? দেখ কেমন ক্ষমতা হাত দেখার। আমাকে দেখেই বলে দিলেন পল্টুর কথা।"

আজমল সাহেব নির্বাক হয়ে গেছেন। যে-স্ত্রীকে কথা বলানো একটা শক্ত দায়িত্ব ছিল, সেই স্ত্রীর কথার দেখেন একেবারে বিরাম নেই। "খুব পসার হচ্ছে ভদ্রলোকের। হবে না? কলেজেরই তো কত মেয়ে, তার উপর তাদের বাপ-মা-ভাই-বোনেরা আছে। ঠকাচ্ছেও অনেকে। একজনের পয়সা দিয়ে দু'জনের হাত দেখিয়ে নিচ্ছে।"

পরের দিন একটা চাপা চাঞ্চল্য যেন ক্লাবেও লক্ষ্য করলেন। একটা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা-দ্রষ্টা ভাব। আজমল সাহেবের সন্দেহ হল অনেকেই বোধ হয় ভাবী কালের উজ্জলতাটা প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। হয়ত তাবিজের সাহায্যে সেটাকে উস্কেও নিয়েছেন খানিকটা।

কিন্তু তাঁর স্ত্রীর ব্যস্ততা আর কমে না। কলেজ শেষে প্রায়ই আশেপাশের গিন্নীদের নিয়ে ছুটছেন গণকের বাসায়। ছেলেও হয়ত গেছিল। টের পেলেন যেদিন সে বলল, "আব্বা ভাল মিষ্টি কোন্ দোকানে পাওয়া যায়?" অনুমান করতে কষ্ট হলো না যে মিষ্টির দরকার হবে পরীক্ষার ফল বেরুলে, নিয়ে যেতে হবে হস্তরেখা-বিশারদের গৃহে।

শেষ পর্যন্ত একদিন আবিষ্কার করলেন যে তিনি নিজে গিয়ে হাজির হয়েছেন ঐ গৃহে। এর একটা ইতিহাস আছে। শরীফা বেগম

দ্বিতীয়বার হাত দেখিয়েছিলেন! তাতে আরও কতগুলো জরুরী খবর পাওয়া গেছে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। "কি? কি?" স্বামীর কৌতুহল খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু স্ত্রী বললেন, "তা বলব কেন?" তখন থেকেই একটা বেয়াড়া সন্দেহ অবুঝ হয়ে পেয়ে বসল তাঁকে। কী আছে এমন খবর যা তার চিরদিনের শান্ত ও বিশ্বস্ত স্ত্রী গোপন করতে চায়? "যাওনা, অত জানার ইচ্ছা থাকে তোমারটা দেখিয়ে এসো না।"—স্ত্রীর পরামর্শে যেন রহস্য আছে গোপন কোন।

ঐ সন্দেহটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একদিন সত্যি সত্যিই গেলেন তিনি জ্যোতিষের বাড়ীতে। স্ত্রীকে সঙ্গে আনলে পাঁচসিকাতে হয়ত সারত, কিন্তু সেই ক্ষতিটা স্বীকার করেই গেলেন। দেখেন বিশ্ব-বিখ্যাত জ্যোতিষী এমন কোন কথা লেখা নেই বাড়ির ওপর, কোন গ্রহেরও আঁকা নেই পাশে। তবে বলা হয়েছে সুলভে হস্তরেখা পরীক্ষা করা হয়। সাহিত্য ও অপরাধশাস্ত্র ত্বরিতে উঁকি দিল। কিন্তু তার আগে তিনি নিজেই উঁকি দিয়ে ফেলেছেন।

ঐ উঁকি দেওয়ার ফলে আর পিছিয়ে আসতে পারলেন না। পরিচিতদের অনেকেই দেখে সারি সারি বসে আছেন ফরাসের উপর। চোখাচোখি হয়ে গেছে, বসতেই হল অগত্যা। পেছনে।

এর ক'দিন পরেই শোনেন নৌকাতে করে কোথায় যাচ্ছেন তাঁর স্ত্রী। কি ব্যাপার? না, কোন-একটা ডোবার পানি খেয়ে সব লোকের সমুদয় অসুখ সেরে যাচ্ছে এক নিমেষে। শরীফা বেগমের গ্যাস্ট্রিক আছে, স্বামীর ডিসেন্ট্রি। তাই চলেছেন পানি সংগ্রহেতে, সহপাঠিনীদের সঙ্গে একত্রে-মিশে। হাজার হাজার মানুষের ভিড় নেই ডোবায়—এক মাঝি এনে দেবে, ভাড়া নেবে মাত্র পঞ্চাশ টাকা। আজমল আলী বুঝিয়ে বললেন—তোমাদের যাওয়ার দরকার কি। মাঝিকেই পাঠিয়ে দাও, নিয়ে আসুক গিয়ে। পরে গোপনে মাঝির সঙ্গে রফা করলেন দশ টাকায়, নদীর সাফ পানি এনে দেবে সে কয়েকটা বোতলে ভরে। লোকটা পাছে কষ্ট না করে নোংরা পানি দেয় ভরে সেই ভয়ে তিনি স্বয়ং গেলেন নৌকাতে বসে। মাঝ দরিয়াতে ঝড়ের মতন ঢেউ উঠেছিল কিছু একটা, এবং ঢেউয়ে দোদুল্যমান

অবস্থায় হঠাৎ তাঁর খেয়াল হয়েছিল যে তিনি সাঁতার জানেন না। তবে কোন বিপদ হয়নি। আর আশ্চর্য স্ত্রীর গ্যাষ্ট্রিক নাকি সেরে গেল ঐ পানিতেই, এবং স্ত্রীর মতে সেরেছে স্বামীর পুরাতন ডিসেণ্টি্রও।

বিপদ হল পরে। ছেলে ফেল করল। আজমল সাহেব রেগেই আগুন, স্বহস্তে অপমান করবেন ঐ গনৎকারের। কিন্তু স্ত্রী তাঁর অনেক বেশী জ্ঞান ধরেন। বললেন, সব কথাই যে ফলবে এমন কি কথা। ফললে তো উনি আর মানুষ থাকতেন না। তাছাড়া তাবিজ নিয়েছি বটে, কিন্তু তুমি তো ঘরে বসে আছ মূর্তিমান অবিশ্বাস হয়ে। কাজ হবে কি করে বল? সর্বোপরি চটানো কি উচিত হবে মনে কর? উপকার না করতে পারেন অপকার হয়ত ঠিক ঠিকই পারবেন করতে। তোমার ঐ প্রমোশনের ব্যাপারটা তো এখনো ঝুলছে সামনে।

আজমল সাহেব নিরস্ত হলেন।

এরি মধ্যে আবার আরেক ঝামেলা। ক্রুদ্ধ এক পত্র নিক্ষেপ করেছেন আজমল সাহেবের বৃদ্ধা মাতা। "কাজটা তুমি ভালো কর নাই। বৌমাকে এই মধ্যবয়সে স্কুল-কলেজ করানো কিছুতেই উচিত নয়। ইহা নিতান্তই ছেলেমানুষি।" মা নাম সইয়ের বেশী লেখা-পড়া জানেন না, অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন চিঠি। পড়ে স্ত্রী উঠলেন লম্ফ দিয়ে। "কী জানে তোমার ঐ সেকেলের মা? লেখাপড়া শিখেছে কিছু? কুসংস্কারের মূর্তিমান ডিপো।" আজমল সাহেব শুনলেন, কিছু বললেন না। ব্যাপারটা কিছুটা জটিল মনে হল তার কাছে।

অনেক জটিল মামলার ফয়সালা অনায়াসে করেছেন তিনি এজলাসে বসে, কিন্তু এই মামলার ফয়সালা করা কঠিন হবে বলে ধারণা হল তাঁর। এবং বিপজ্জনকও বটে।

ঘটক

মরিয়া হলে মানুষ অনেক কিছুই করে, করতে পারে, করে থাকে। আমার এক বন্ধু ঘটকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। শর তিনি আগেই ছুঁড়েছিলেন। লক্ষ্যবস্তুটাও জানা ছিল স্পষ্ট, যদি করতে পারতেন লক্ষ্যভেদ তাহলে রাজকন্যা তো আসতোই, অর্ধেক রাজত্বও ছিল অবধারিত। কিন্তু বিদ্ধ করা দূরে থাক, তীর যে অকুস্থলের আশেপাশে গিয়ে পৌঁছেছে এবিষয়েও ঐ তীরন্দাজ বন্ধুর মনে ঘোরতর সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। অতএব, অগতির ঘটক সহায়।

ঠিকানাটা আমিই দিয়েছিলাম। পরিচয় ছিল। এক-একজন মানুষ এমন আছে না যাদের একবার দেখলে বাকি জীবনে কখনো ভোলা যায় না? আর দেখা মাত্র মনে হয় অনেক অনেক দিনের চেনা? এই ঘটক ভদ্রলোক ছিলেন সেই রকমের। প্রথম দর্শন এক বিয়ে বাড়িতে; দেখি সেই হট্টগোলের ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে অটল শুধু ঐ একজনই। কিন্তু কোথায় যেন দেখেছি এর আগে। খেয়াল করলাম, হ্যাঁ, তাইতো, এতো অবিকল সেই চেহারা যাঁকে প্রায় রোজ দেখি প্রিয় এক চায়ের দোকানে, ক্যাশবাক্স সামনে রেখে অতি উচ্চাঙ্গের ভাব নিয়ে বসে আছেন। আধ্যাত্মিক ভঙ্গি। খাও, খাও, যত ইচ্ছা খাও, খেয়ে নাও। যখন পয়সা নিচ্ছেন গুনে গুনে তখনো ঐ একই উদাসীনতা—।

তিনি যে কন্যা পক্ষের লোক ন'ন সেটা বোঝা গেল সহজেই। ঐ নিরুদ্বিগ্নতা দেখেই। কেউ রাগ করল কিনা, অপমান হ'ল কিনা কোন সম্মানীয়, কোথাও ঘাটতি হল কি খাদ্যের—এসব নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র বিকার নেই। পাত্র পক্ষেরও হবেন না, কেননা সেই গুমর

কোথায় ? আমরাই সব মালিক, আমরাই সব কিছু এমন একটা হাম্বড়াই ?"
"কোন পক্ষেরই নয়, উভয় পক্ষেরই"—যিনি বললেন তিনি রসিক লোক, প্রায় টেনে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। "পরে কাজে লাগবে।"—তাঁর চুপ-চুপ মন্তব্য।

এতদিনে কাজে লাগল বুঝি। তাঁকে ধরতে অনেক ক'দিন ঘোরাঘুরি করতে হল। ছোটাছুটির মানুষ। অনেক সময় তাঁকে পথে দেখেছি। ছাতা মাথায়, ব্যাগ হাতে, হন হন করে চলেছেন। প্রীতিকর লেগেছে সেই দৃশ্য। মেলাবেন, মেলাচ্ছেন, মিলিয়ে দিতে চলেছেন। এই ঝগড়া আর হানাহানির সংসারে মিলনের সেতু নিরবধি গড়ে চলেছেন, তাঁর পায়ের শব্দ যেন সৌহার্দ্যের পদধ্বনি। দু'য়েক দিন তাঁর বিস্তৃত ছাতার নীচেও দাঁড়িয়েছি আমি। খবর জানতে চেয়েছেন দু'চারটে, অমুককে চেনেন ? কত আয় ? কেমন দায়-দায়িত্ব ? কি করে তার বাপ ? সাহায্য করতে কুণ্ঠা হয়নি—কেননা তিনি তো ভাঙ্গার লোক নন, গড়ার কারিগর, হাতুড়ে নন, পেশাদার। দেখি টুকে নিচ্ছেন তাঁর ছোট্ট নোটবুকে।

বিয়ে ঠিক করে-দেন এই-রকমের লোক আরো দেখেছি। কারো মধ্যে সৌখিন বাতিক, কারো কাছে পরোপকার-প্রবৃত্তি। তারপর যদি কিছু অশান্তি ঘটল বিবাহিতদের মধ্যে, বাধল বিবাদ, বাতিকগ্রস্ত বললেন—কপাল ! আর হয়ত হাসলেন হো হো করে—আমিতো বিয়ে দিয়েছি বিয়ে খাওয়ার জন্য। তার বেশী কী জানি ? পরোপকারীও হাসেন ঐ ক্ষেত্রে—দয়ার হাসি, মায়ার নয়। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ছোট মনে হয়, অভিযোগ এনে খাটো ঠেকে নিজেকে। এই ঘটকও হাসতেন। হো হো হাসি নয়, আত্মসন্তুষ্ট হাসিও নয়, শিল্পীর হাসি, যেন মেঘের শেষে রোদের খেলা।

যেদিন তাঁকে ধরা গেল, দেখি সেই সহজ প্রসন্ন হাসি। আমরা কিছুটা ভয় পেয়ে গেছি, অল্পই বয়স, তার উপর একটা ষড়যন্ত্র-ষড়যন্ত্র ভাব। "আপনার কাজ তো সোজা কাজ নয়।" বন্ধু সহজ হবার চেষ্টা করলেন। চাঁদা আদায় করতেই কত কষ্ট হয় আমাদের—আর আপনার হ'ল লাইফ বের করে আনা ! আস্ত লাইফ, লাইফ ইনসিয়োরেন্সের চেয়েও কষ্টকর"—আমি যোগান দিলাম, "এতো জীবন বীমা নয়—জীবনই।" কিন্তু তিনি

স্ফীত হলেন না—হাতুড়ে হলে হতেন, বিকারগ্রস্তরা হন, পরোপকারীরাও। ব্যস্ততার প্রসঙ্গ উঠলো। আমি বললাম, "হ্যাঁ, সে তো বটেই। বিয়ে দেওয়া। তার উপর এতদিনে কত কত ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন, তারাও ছাড়ে না নিশ্চয়ই, দেখা হলে টেনে নিয়ে যায় জোর করে, আদর করে, আপ্যায়ন করে।"

"পাগল!"—শান্ত মানুষটা যেন উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন হঠাৎ। চেহারার সঙ্গে মেলে না কণ্ঠস্বর। চমকে উঠেছিলাম। অন্য কেউ কি ঢুকল ঘরে? না, কেউ ঢোকেনি, শুধু আমার কথাটাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন তিনি প্রবল বেগে।

"পাগল! বিয়ের পরে আর ঐ মুখো হই আমি? বিয়ের রাতেই আমার শেষ, অন্যের শুরু। তারপর থেকে তো শুধু কি করে কতটা এড়িয়ে চলা যায় তারই চেষ্টা।" আমার কল্পনা মস্ত একটা ধাক্কা খেল। ব্যাপারটাকে আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে দেখেছিলাম।

"কেন?"—উচ্চাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর সন্ত্রস্ত প্রশ্ন।

"ছুরি নিয়ে তেড়ে আসে সাহেব! সত্যি সত্যি ছুরি। একবার সকালে গেছি এক বাসায়। বোধ হয় ঝগড়া চলছিল খাবার টেবিলে, দু'টো রুটি-কাটা ছুরি নিয়ে একসঙ্গে, স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে ধাওয়া করেছে আমাকে। বাপরে বাপ!"

কল্পনা ধাক্কা খেয়েছিল বটে, কিন্তু বসে থাকেনি। দেখতে পেলাম নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে অত্যন্ত বিচলিত এই শিল্পী, ঐযে অত ছোটাছুটির কাজ সে শুধু পাত্র-পাত্রী খুঁজতেই নয়, বিবাহিতদের নাগালের বাইরে থাকার জন্যও। গড়ার জন্য ঘুরছেন, গঠিত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আর তখনি মনে হল ব্যস্তসমস্ত ঐ পেশার ভেতরে একজন জীবন্ত মানুষ আছে কোথাও, স্থির হয়ে।

"সব বিয়েই কি এই রকম?"—খুব করুণ শোনালো বন্ধুর প্রশ্ন।

"কি রকম?"

"এই যে মারামারি!"

"হ্যাঁ, তা তো আছেই। কোন্ বিয়েতে অশান্তি নেই বলুন? ক্ষোভ নেই কোথায় শুনি? আর যদি অন্যের কাঁধে দোষ চাপানোর মওকা মেলে তাহলে ঐ অশান্তিটা একেবারে লাফ দিয়ে ওঠে, পিছু পিছু ধাওয়া করে, ধরতে পারলে মারতে চায়। অন্যকে দায়ী করে নিজেরা দায়মুক্ত হয়।"

আমার বন্ধুটি পাত্রীতে শুধু নয়, পাত্রীর পিতার ব্যাপারেও উৎসাহী ছিলেন। বললেন শুধু স্বামী-স্ত্রী'র ব্যাপারতো (যেন সেটা কিছুই নয়), মেয়ের বাপেরা নিশ্চয়ই এর ভেতর আসে না!"

"তারাইতো বেশী"—পেশার ভেতরের মানুষটা নড়েচড়ে ওঠে, "এক বাবাতো এখনো খুঁজছেন আমাকে।"

"কেন, কি হয়েছিল?"—এই উদ্বিগ্ন প্রশ্নটা আমার।

"কী আর হবে! চিটিং! লণ্ডন থেকে এসেছে, বলে মস্ত পাস দিয়েছে, আস্ত বাড়ি করেছে। তিন দিনে বিয়ে চাই। তাই সই। দিলাম ঠিক করে, ঠিক যেমনটা চেয়েছিল তেমনি। মাস না-যেতেই বাপের কাছে চিঠি এল বিলাত থেকে—পাস তো দূরের কথা, ভর্তিই হয়নি সে-শ্রীমান, আর বাড়ি, সে তো পাতালপুরীতে অন্ধকূপ। রাত-দিন কান্নাকাটি করছে মেয়ে। পিতার একমাত্র সন্তান! একদিন পথে পেয়ে আমাকে তাড়া করেছিলেন ভদ্রলোক। দৌড়ে পালিয়েছি। ছেলেবেলায় দৌড়ের অভ্যাস ছিল। সেটা এত উপকারে লাগবে কখনো ভাবিনি। ভাগ্যিস মেয়ের মা'রা পথে তেমন চলাফেরা করেন না, নইলে আমাদের পথ চলাই বন্ধ হত।" বলে হাসলেন সেই অপরিচিত হাসি।

আসল কথায় আসা বিঘ্নসঙ্কুল দেখে আমরা অন্য-কথার আবছায়া তৈরী করছিলাম!

"কেমন চলছে ব্যবসায়?" "আর ব্যবসায়! বাড়ির দালালি আরম্ভ করেছি।"

"কেন? কেন?" আমাদের উদ্বেগ হয়, পুনরায়।

"কেন? কেন আবার, ঐ যে বললাম, চিটিং! ভালো পাত্র যারা তারা নিজেরাই ব্যবস্থা করছে বিয়ের, আমাদের কাছে আসে যারা তারা

একেবারে ওহা। সমাজটা বদলে গেছে, বুঝলেন না, এখন আর আগের সেই দিন নেই।" তারপর অনেকটা স্বগতোক্তির মতই এক যুবকের কথা বললেন। সেদিন সকালেই এসেছিল সে। তার যোগ্যতা কি? না, সে বি.এ.। আর? আর কি আছে? আর, আর কিছু নেই, তবে আছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা। "আছে যে সে তো যে-পাত্রীর উপর বাবা-জীবনে চোখ রেখেছেন তাকে দেখেই বুঝতে পারছি।" এই সঙ্গে ওঁর মন্তব্য, "বুঝলেন কিনা এই উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের খুব ভিড় আজকাল—তাদের জ্বালাতেই ব্যবসায় আজ লাটে উঠবে"—বলে যেন তাকালেন আমাদের দিকে। কার দিকে বলা মুস্কিল। একটু ট্যারা মতন ছিলেন তিনি। মনের দিক দিয়েও ঐ রকম—তাঁর মক্কেলরা বলতে চাইত, কার স্বার্থ দেখেছেন ঠাহর করা মুস্কিল, পাত্রপক্ষ ভাবল অবশ্যই তাদের, পাত্রীপক্ষ ধরে নিল তাদেরই নিঃসন্দেহে। ঐজন্যেই নাকি ওঁর বিশেষ পসার।

কি জানি কি-একটা বলে আমরা গুটি গুটি সরে পড়েছিলাম। কিন্তু ফেরার পথে মনে হল ঘটকের বাইরের ঢাকনাগুলো সব খুলে গেছে—ভেতরে একজন মানুষ দেখে এসেছি। আর পাঁচজন মানুষের মতই।

কিছুদিন পরে পথে একদিন উচ্চাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর সঙ্গে দেখা। ইতিমধ্যেই তিনি পাত্রীস্থ হয়েছেন। বেশ সন্তুষ্ট চিত্ত। বললেন—শুনেছ সেই ঘটকের খবর? কিছু-কিছু এর আগেই শুনেছিলাম, ঐ বন্ধুর মারফতই। যেমন নাকি তাঁর স্ত্রী গৃহত্যাগ করেছে অন্যের সঙ্গে। (সত্যমিথ্যা জানি না, হতে পারে খবরটা বিদ্বেষপ্রসূত)। শুনেছিলাম, তিনি ঘটকালি ছেড়ে এখন বাড়ির দালালি করছেন। দেখলাম বন্ধুর রাগ পড়েনি। "উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলে না কটাক্ষ করেছিল আমাদের দিকে! এখন নিজেকেই পেয়েছে সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষায়।"

ঘটনার বিবরণ এই যে, পঞ্চাশ পেরিয়ে ঐ বৃদ্ধ এখন নিজেই পাত্র হয়েছেন, উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরম। পাত্রী গরীব বটে, এবং পাত্র যথেষ্ট টাকাওয়ালা, কিন্তু মেয়ের বয়স তো আঠারো! অন্যপাত্রের জন্য তাকে দেখতে গিয়েছিলেন ঐ ঘটক, শেষে ভিমরতিতে পেল। এখন টাকা-

পয়সা—লোককে তো কিছু কম ঠকায়নি, গাছেরও খেয়েছে তলারও কুড়িয়েছে—বিষয়-আসয় যা কিছু আছে সব নিয়ে সাধাসাধি করছে। মেয়ের বাপের মন গলে না। "খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে!" বলে হো হো করে হাসলেন বন্ধু।

ব্যাপারটা হয়ত হাস্যকরই, কিন্তু আমার হাসি পেল না; হয়ত এঘটনা দুঃখের, কিন্তু আমার দুঃখও হল না। শুধু মনে হলো ঐ মানুষটা আরো বেশী জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। এখন তিনি কোন পেশাদার নন, শিল্পী নন, দালাল নন, সমাজতাত্ত্বিক নন—কোন কিছুই নন। শুধুই মানুষ একজন। নিজের সমস্ত কাজের চেয়ে যিনি বড়। ঘটকের যদি মৃত্যু হয় তো হোক গিয়ে, মানুষের তো জন্ম হয়েছে।

পুরাতন সম্পাদক

পত্রিকার সম্পাদকদের আমি সমীহ করি বরাবরই। তাঁরা আয়োজন করেন, সরবরাহ করেন, সেবা করেন বলতে গেলে, কিন্তু থাকেন পত্রিকার অন্তরালে, যদিও উপস্থিত থাকেন সর্বক্ষণই—সবটা পত্রিকা জুড়ে। ঘটনাক্রমে এঁদের একজনের সঙ্গে সেদিন পরিচয় হয়ে গেল।

সেই ছোট শহরে আমি গেছিলাম কর্তব্যপালনে। শেষ হয়েছে কাজ। করবার নেই কিছু, ফিরবারও দেরি আছে বেশ কিছুটা সময়, এই রকম অবস্থায় যিনি আমার পরিচালক ছিলেন শহরবাসকালে তিনি বললেন, চলুন ঘুরে আসা যাক। সেই ঘুরতে গিয়ে শহরের পাবলিক লাইব্রেরীতে গিয়ে উঠলাম দু'জনে। ওঠাটা অনিবার্য ছিল এই লাইব্রেরীতে, শহরের গৌরব একটি—এমন কি বাইরের লোকেরাও স্বীকার করেন সে-কথা, এবং স্বীকার করানোর জন্য শহরের লোকেরা নিয়ে যান ডেকে এই লাইব্রেরীতে, বই দেখান, পত্রপত্রিকা সামনে ধরেন খুলে, পরিচয় করিয়ে দেন লাইব্রেরীয়ান সাহেবর সংগে।

এই লাইব্রেরীতে এসে পুরানো পত্রিকার বাঁধানো এক সেট পেলাম হাতে। এটাও অনিবার্য ছিল, এই হাতে আসাটা, ঐ বাঁধানো সেটের। পত্রিকাও শহরেরই, শহরের বিশেষ কীর্তিসমূহের একটি। লোকেরা স্বীকার করেন এই কথাও, এই লাইব্রেরীতে আসার পরে, এই পত্রিকা নেড়ে চেড়ে দেখে। আমি জানতাম এই পত্রিকাকে, নাম শুনেছি অবশ্যিই, চকিতে দেখেছিও কখনো-সখনো চলতি বাসের জানালা দিয়ে-দেখা দৃশ্যের মত। এবার অন্তরঙ্গ ভাবে একত্রে এক-সঙ্গে দেখবার মওকা পাওয়া গেল পত্রিকার সবগুলো সংখ্যা। পুরানো

পত্রিকা নতুন পত্রিকার চেয়েও আমার ভালো লাগে পড়তে, ভালো লাগে পেছনে চলে যেতে মানস-ভ্রমণে, এখানে-সেখানে হানা দিতে ইতস্তত, এ-পাড়াতে ও-পাড়াতে।

পত্রিকাতে আগ্রহ দেখে নিশ্চিন্ত হলেন আমার সঙ্গী, খুশীও হলেন সেই সঙ্গে। আমি বললাম, আপনি যান, আমি ফিরে আসব সন্ধ্যার পরে। তিনি চলে গেলেন, তাঁর কাজও ছিল বাইরে।

তা প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের আগের পত্রিকা। মাসে মাসে বার হ'ত, এই শহর থেকেই। তরুণ একজন দায়িত্ব নিয়েছিলেন সম্পাদনার। তরুণই হবেন, কেননা উদ্দীপনা ও উৎসাহের একটা নিয়মিত ধারা প্রত্যেকটি সংখ্যার পেছনে অবিরাম বইছে বোঝা যায়, না-বইলে এই পত্রিকা বার হ'ত না, বার হলেও ভাসতে পারত না, মফস্বলের ক্ষুদ্র জলাশয়ের পাঁকের মধ্যে পড়ে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে যেত চিহ্নবিহীন। উদ্দীপনা নয় শুধু—পরিশ্রম ছিল অমানুষিক। লেখক-গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষকদের মনোরঞ্জনের অসম্ভব দায়িত্ব তো ছিলই, অতিশয় নিষ্ঠুররূপে ছিল দারিদ্র্য। তবে পারেনি, সেই ভীষণ দারিদ্র্য পারেনি তাঁকে স্তব্ধ করে দিতে। নিজেই তিনি বাঁধাই করতেন, স্বহস্ত শ্রমে। ডাকঘরে বয়ে নিয়ে যেতেন সেও তিনি। পত্রিকার পিওন, প্রুফ-রীডার সেও, অন্য কেউ নন, সম্পাদক নিজেই। তবু তাঁর আপত্তি ছিল না, অভিযোগ থাকত না কোনপ্রকারের, যদি তিনি নিয়মিত আত্মপ্রকাশ করতে পারতেন, মাসে-মাসে যথাযথ বার হ'ত, পৌঁছাতো পাঠকদের কাছে। তা হয়নি। দুঃখ তাঁর সেইখানেই, তাঁর একমাত্র দুঃখ। অভিযোগও সেখানেই, লজ্জাও বটে। নতুন বছরের শুরুতেই তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এই নিয়ে, তাঁর অতিশয়-বিরল একটি সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয়তে। প্রতিজ্ঞা করেছেন আরো কঠিন হবে তাঁর অধ্যবসায়, দৃঢ় ও অনমনীয় হবে তাঁর সঙ্কল্প। তিনি আসবেনই, নিয়মিত হাজির হবেনই পাঠকদের ঘরের ও মনের দরজাতে।

দেখতে পাচ্ছি অনেক কঠিন কঠিন বিষয়ে বহু মূল্যবান কথা বলছেন, পত্রিকার পণ্ডিত লেখকেরা। "বঙ্কিম চন্দ্র কি সাম্প্রদায়িক নন?"

থেকে শুরু করে 'পৌরবিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান' পর্যন্ত নানা প্রসঙ্গ এসেছে পত্রিকার পাতায়, কলরোল কোলাহল করে উঠেছেন বিজ্ঞ বুদ্ধিজীবীরা। পুঁথি-সাহিত্য নিয়ে তৎপরতা প্রদর্শন করেছেন কেউ, কেউ-বা কথা বলেছেন ভারতবর্ষের রাজনীতি নিয়ে। কবিতা আছে, আছে ধারাবাহিক উপন্যাসও। শুধু কথা নেই সম্পাদক সাহেবের। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তিনি যোগান দিচ্ছেন, ডেকে আনছেন সবাইকে, মৃদু-মধুর হেসে বলছেন, আমি কে? আপনারা বুজর্গ লোক, আপনারাই বলুন কথা, শুনুক জগৎবাসী। বলে তিনি হয়ত বেরিয়ে গেছেন ডাক-পিওনকে ধরতে, নয়ত তাগাদা দিতে ছাপাখানাওয়ালাকে, অথবা সুঁই-সুতো নিয়ে বসেছেন সেলাই করতে পত্রিকা। এবং এক অদৃশ্য সুতোর মত উপস্থিত আছেন পত্রিকা জুড়ে, তিনি আছেন বলেই আছে পত্রিকা, তত্ত্বকথার ব্যস্ত কোলাহল ও কল্পনার সবল অনুশীলন। তিনি সর্বত্র আছেন, তা-ই কোন একটা জায়গায় নেই, যেমন আছেন অন্যান্যরা, লেখকেরা, তাঁর কাগজের। যেন তিনি ঈশ্বর একজন।

ব্যতিক্রম আরো দু'টি আছে, আরো দু'টি সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। একটিতে তিনি শেষ পর্যন্ত প্রায় কেঁদেই ফেলেছেন আবেগে। এই সম্পাদকীয় স্তম্ভটি দাঁড়িয়ে আছে একজন তরুণ কবির দোকানকে ঘিরে। কবি দোকান খুলেছেন তামাকের, খুলে অভাব ঘুচিয়েছেন নিজের। সেই তামাক তাঁর কবিতাতেও অনুপ্রবেশ করেছে কি না জানি না, আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়িনি তাঁর কবিতা, তিনি বড় কেউ ন'ন—না দোকানীত্বে, না কবিত্বে। কিন্তু যে-আদর্শ তিনি তুলে ধরেছেন স্বাবলম্বনের, সেই অত্যুচ্চ আদর্শের প্রশংসা করতে গিয়ে স্তম্ভ দেখা যায় কেঁপে কেঁপে উঠেছে, কাঁপতে কাঁপতেই গড়ে উঠেছে বলা যায়, গড়ে উঠে শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়তে চেয়েছে আবেগে। হে হতভাগ্য জাতি, দেখ, দেখে শেখো। কাব্য-সাধনা ও তামাক-সাধনা কি করে একত্রে করা যায় তার তালিম গ্রহণ কর। স্তম্ভের মাল-মসলায় আছে সমাজদরদী একজন পাঠকের একটি মূল্যবান পত্র। এই পত্র পড়েছি আমি, সেই পত্র পাঠ করে তবেই সম্পাদ-

কীয়তে আসা। পত্রলেখক বেদনার্ত ও মর্মভেদী এক জিজ্ঞাসা তুলে ধরেছেন। মুসলমান ছেলেরা কেন ময়রার দোকান খোলে না? না, তিনি ছোঁয়াছুঁয়িতে আদৌ বিশ্বাস করেন না। মিষ্টি খান, খান হিন্দু ময়রার দোকান থেকেই। খেতে-খেতে মিষ্টিকে দেখেন, ময়রাকে দেখেন, দেখেন প্রচণ্ড গরমে কি করে ময়রার গা থেকে টসটসে ঘাম পড়ছে গলেগলে, টপ্ টপ্ করে, ফোঁটায় ফোঁটায়— মিষ্টির উপরই। মিষ্টি খান, মিষ্টি খাবার ফাঁকে ফাঁকে দেখেন। কিন্তু ঘামে তার প্রধান আপত্তি নয়, জাতবিচারের সাম্প্রদায়িক কথাও নেই তাঁর পত্রের কোথাও, আছে শুধু এই তিক্ত দুঃখ যে, তাঁর নিজের সমাজের যুবকেরা কেউ অদ্যাবধি এই সুমিষ্ট-ব্যবসায়ে হাত দিল না। উদ্যম নেই যুবকদের, আগ্রহ নেই কোন প্রকারের। অথচ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এগিয়ে না-এলে বাঙ্গালী মুসলমানদের মুক্তি কোথায়? শোনেনি কি বলেছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র? সম্পাদক সাহেব সাগ্রহে হাতে তুলে নিয়েছেন সেই বক্তব্য। এই শহরে পান বিড়ি ও মিষ্টির দোকান হু হু করে বাড়ছে, কিন্তু ক'জন মুসলমানকে দেখা যাবে নিজ হাতে দিচ্ছে সাজিয়ে পান অথব মিষ্টি দিচ্ছে তুলে শাল-পাতার ঠোঙ্গায়, পয়সা নিচ্ছে গুনে গুনে?

আমি প্রায় তন্ময় হয়ে পড়ছিলাম। স্থানের দূরত্বের চেয়ে সময়ের দূরত্ব আমার কাছে সকল সময়েই অধিক মনোহারী। ঐ বাঁধানো সেট হাতে নিয়ে আমি চলে গিয়েছিলাম পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের দূরত্বে। সেই তামাক, পান-বিড়ি, ময়রার দোকানের সামনে। ধারাবাহিক উপন্যাসের নায়কের গ্রামে। সম্পাদক সাহেবের অভিমান-ক্ষুব্ধ হৃদয়ের কাছে।

পান-বিড়িতে অবশ্য আমার একটু খটকা লাগল। বরাবরই লাগে। খুব অল্পবয়সের কথা মনে আছে। আমাদের মফস্বলের বাসায় এসেছিলেন এক ভদ্রলোক। আমার হাফইয়ার্লির পড়া বাইরের ঘরে বসে হেলে-দুলে মুখস্থ করছিলাম। এরি মধ্যে তিনি এলেন। ময়লা ছাতা, চকচকে মাথা ও দগদগে মুখ নিয়ে। আব্বা নেই শুনে বললেন, বসবেন তিনি, অপেক্ষা করবেন। ঘরে বসে থেকে থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস

করলেন, সাধারণ জ্ঞানের, আর হাসলেন হো হো করে। আরো একটা কাজ করেলেন। পান খেলেন অবিরত। জানালা দিয়ে ইতস্তত ছুঁড়ে মারলেন। মেঝেতে, জানালায় ছাপ পড়ল, টেবিলও রইল না অক্ষত। তারপর সেই খাঁ-খাঁ ভীষণ দুপুরে ছোটালেন আমাকে অনেক দূরের দোকানে, পান আনতে। পানাসক্ত সেই রঞ্জিত মুখ মনে আছে আমার, রক্তে-ভীষণ মুখ, খুনীর মুখ আস্ত।

তুমুল যখন আন্দোলন চলেছিল পাকিস্তানের তখন একটা গান শোনা যেত প্রায়ই। "কান মে বিড়ি, মু'মে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।" লড়কে লেঙ্গে তো বটেই, কিন্তু বিড়ি কেন? পানের কি করবার আছে, করবার আছে পাকিস্তানের ব্যাপারে? পাকিস্তান কি হবে পান-বিড়িওয়ালাদের স্বর্গ? নাকি এমন স্বর্গসুখ থাকবে পাক পাকিস্তানে যে সবাই, সকলেই, পান-বিড়ি খাবে অবাধে, মনের সুখে? বুঝতে পারতাম না ঠিক। কিন্তু ঠিক না-বোঝার মধ্যেও প্রথম সম্ভাবনার চেয়ে মারাত্মক মনে হয়েছে আমার দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিকে। সেই মুখের কথা মনে পড়েছে আমার, প্রতিবারেই, সেই পান-দগ্-দগে রক্তরঞ্জিত মুখ, খুনীর মুখ। তা মুখ না হয় সহ্য করা গেল কোনমতে, কিন্তু ঐ যে রস-সিক্ততা মুখের, তার অসম্ভব-পারঙ্গমতা সেটা অত্যন্ত তটস্থ রাখে, অতিশয় আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখে আমাকে, সব সময়ে। ষড়ঋতুর লীলারঙ্গভূমি এই বঙ্গদেশে রঙের তো কোন অভাব নেই কোন দিক দিয়ে, প্রকৃতি নিজ হাতে রঙিয়ে দিয়েছে দেশকে। মানুষ, পাখি, জন্তু, কীটপতঙ্গ কেউই ইতরবিশেষ করেনি, নানা ভাবে নানা কীর্তি দিয়ে, উপায় দিয়ে অহরহ রঙ্গীন করে চলেছে, পিচ্‌কিরি ছিটিয়ে চলেছে অবিরাম। এর মধ্যে পানের আবার এই হঠকারিতা কেন, এইভাবে ক্ষত-বিক্ষত করা মানুষকে? তবে মেয়েদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁরা রঙীন করুন ঠোঁট, বাঁচে যদি দুর্লভ করেন একস্‌চেঞ্জ তো মন্দ কি?

কিন্তু আমি প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছি। আমার কথা পান নিয়ে নয়, বিড়িও নয়, আমার কথা সম্পাদককে নিয়ে। তিনি আরো একবার প্রত্যক্ষে এসেছেন পত্রিকায়, অন্য-একটি প্রসঙ্গে। পত্রিকারই লেখক

একজন নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। সম্পাদক সাহেব বলেছেন, ভিন্ন-একটি সম্পাদকীয়তে, যেন তাঁকে, এই লেখককে, ভোট দেন সকলে। তিনি একজন লেখক বলে নয়, তিনি, একজন প্রকৃত সমাজহিতৈষী বলে। নির্বাচনের কি ফল হয়েছিল, কতটা সাড়া দিয়েছিল পাঠকেরা এই আকুল আহ্বানে সেটা অবশ্যি জানা যায়নি। পরের সংখ্যাতেও নয়, তার পরেরটিতেও নয়। তার দু'য়েক মাস পরে দেখছি বন্ধ হয়ে গেছে পত্রিকা। একেবারে বন্ধ হয়নি। ক্ষীণাঙ্গে বেরিয়েছে দু'য়েকটি। ইতস্তত. অনিয়মিত। দেখলাম বিজ্ঞাপন আছে সম্পাদক সাহেবের নিজের লেখা বইয়ের। বই লিখেছেন ইসলাম নিয়ে, 'মহাকবি' ইকবাল বিষয়ে। বোঝা যাচ্ছে সময় পেয়েছেন, অবসর জুটেছে নিজের লেখা লিখার। কিন্তু পত্রিকা, পত্রিকা আর থাকেনি, শেষ হয়ে গেছে। বাঁধানোর শক্ত পিজ্‌বোর্ড নিশানের মত ঘোষণা করছে সেই কথাটা।

অনেক আমার জিজ্ঞাসা জমেছিল মনে। এখন কী করেন সম্পাদক সাহেব? কেমন আছেন? কতটা তরিক্কি হয়েছে তাঁর পাকিস্তানের কালে? কেমন টেনে নিয়েছেন তেলে-ঝোলে?

সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাসায় ফিরে।

কেন, শোনেননি?—যেন শোনা উচিত ছিল আমার। সবাই জানে সেই খবর, এই শহরের সকলেই জানে।

তিনি চাকুরি নিয়েছিলেন স্কুলে। অল্প মাইনের ছোট শিক্ষকতা। ঐটুকুই, ঐটুকুই উন্নতি। বিয়ে করেছেন, সংসার ছিল, দায় ছিল, ছিল দায়িত্ব। পত্রিকা আর বের করেননি, পারেননি করতে, বই লিখেছেন পাকিস্তানসম্মত বিষয়ে আরো কয়েকটি।

কিন্তু সে-সমস্ত সামান্য খবর, কেউ জানে, কেউ বা জানেনা, জানে নাই বেশীর ভাগ লোকে। কিন্তু এই শহরের সবাই, সকলেই জানে, কি করে প্রাণ দিয়েছেন মাষ্টার সাহেব, পাঞ্জাবী মিলিটারির হৃদয়হীন হাতে।

মিলিটারি শহরে ঢোকে এপ্রিলের প্রথম দিকে। তার আগেই ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল শহর। যখন কাছে এসে পড়েছে তারা খবর পাওয়া গেল, তখন চলে গেল বাকি যারা ছিল সবাই। কেউ. ছেলে বুড়ো,

স্ত্রী পুরুষ কেউ পড়ে রইল না শহরে। কিন্তু মাষ্টার সাহেব রইলেন, তিনি গেলেন না। তাঁর স্ত্রী ও কন্যা বেঁধেসেধে তৈরী ছিলেন, কিন্তু মাষ্টার সাহেব নড়বেন না। কেন যাবেন? মিলিটারি কেন হাত দেবে তাঁর গায়ে? পাকিস্তানের পক্ষে পত্রিকা বার করেছেন, বই লিখেছেন। সে-সব থরে-বিথরে সাজানো আছে ঘরে। ধর্মবিষয়ক পুস্তক বিস্তর আছে সেলফে। দেয়ালে আছে কায়েদে আজমের ছবি। আরো আছে, আছে পাঞ্জাবী ডি, সি'র চিঠি একটা, পাকিস্তান ও ইসলামের পক্ষে সম্পাদক সাহেবের কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। টাইপ-করা সেই চিঠি কাঁচে বাঁধাই করা ছিল, সযত্নে টাঙানো ছিল ঘরের দেয়ালে। তিনি অযুক না তমুক যে তাঁকে কিছু বলবে মিলিটারি। নিরুপায় স্ত্রী ও কন্যা চলে গেল। তিনি গেলেন না, তিনি রইলেন বাড়িতে, একা। সাহস ছিল দুরন্ত।

মিলিটারি এসেছিল। এসে তাঁকেই শুধু পেয়েছিল। শুধু ঐ বাড়িতে নয়, পাড়াতেও শুধু তিনিই ছিলেন। এবং তাঁকে তারা হত্যা করেছিল সামনাসামনি।

সে-রাতে আমার ঘুম হ'লনা কিছুতেই। না-দেখা সম্পাদক সাহেবকে বার বার দেখলাম, থেকে-থেকে দেখতে পেলাম মুখোমুখি। বিশেষ করে তাঁর অন্তিম মুহূর্তগুলো। পাঞ্জাবীরা এসেছে। ধাক্কা দিয়ে ঢুকেছে ঘরে। তিনি পত্রিকা দেখাচ্ছেন, বই দেখাচ্ছেন। জিন্নাহ্‌ সাহেবের ছবি দেখাচ্ছেন। দেয়াল থেকে টেনে নামালেন ফ্রেমে-বাঁধানো চিঠি পাঞ্জাবী ডি. সি'র। বুকের কাছে তুলে ধরলেন, যেন শক্ত বর্ম, যেন নির্ভয় ঢাল। আর কিছু নেই মৃত্যু ও তাঁর মাঝখানে, শুধু ঐ চিঠি, ঐ ফ্রেম। হাউ-মাউ করে উঠলেন। না—

এখনো, যতবারই আমি কল্পনা করি সেই দৃশ্য, শিউরে উঠি ভয়ঙ্কর আতঙ্কে। যেন আমি, আমিই সেই সম্পাদক, আমি নিজেই যেন বাঁচতে চাইছি, ভিক্ষা করছি প্রাণ, পা'য়ের উপর হাউ-মাউ করে ভেঙে পড়েছি পাঞ্জাবীর।

এই আতঙ্ক থেকে বাঁচার জন্য সেদিন রাতে একটা কাজ করেছিলাম মনে পড়ে। মনে মনে খসড়া করেছিলাম একটা চিঠির। ঠিক তেমন চিঠি

যেমনটি সমাজদরদী পাঠক লিখেছিলেন একদিন, ময়রার দোকান বিষয়ে। কিছুটা ব্যস্ত হওয়া গেল এই চিঠি নিয়ে, সেই অন্তিম চেহারাটা ঢাকা পড়ল সম্পাদক সাহেবের।

সম্পাদক সাহেব এর চেয়ে যদি মিষ্টির না-হোক একটা সামান্য পান-বিড়ির দোকানই দিতেন আপনি, তবে ঐ কাগজের সামান্য টুকরো নিয়ে দাঁড়াতে হ'ত না আপনাকে বর্বর মিলিটারির সামনে। আমি লিখলাম অলিখিত চিঠিতে। আপনার পয়সা হ'ত, আপনি সতর্ক থাকতেন, আপনি পালাতেন সময় মত, হয়ত বা স্ত্রী-কন্যারও আগে। এটা কোন অভিমানের কথা নয়, সম্পাদক সাহেব, বাস্তব ও সত্য কথা। আজ আপনার বিধবা স্ত্রী জানে, জানে আপনার অবিবাহিতা কন্যা, কত বাস্তব, কত নির্মম এই সত্য। মুক্তির পথ আপনি ঠিকই জেনেছিলেন, যখন বলেছিলেন মাসিক পত্রিকাতে ব্যবসায়ের কথা।

কিন্তু সেই পথে নিজে তো যাননি আপনি! শিখিয়েছেন, কিন্তু আচরণ করেন নি।

চিঠি পড়ে কেমন হয়েছিল সম্পাদক সাহেবের চোখের দৃষ্টি সে আর আমি কল্পনা করতে পারিনি। আমি তাঁর আতঙ্কগ্রস্ত মুখটাই দেখতে পাচ্ছি শুধু। সেই যখন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন—নিজের ঘরে, কাঁপছেন ঠক্‌ঠক্ করে, ডি, সি'র চিঠিটাকে বুকের উপর তুলে ধ'রে। সেই যখন জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান শুধু সামান্য একটা টাইপকরা কাগজের।

বন্ধুর মৃত্যু

এতদিন পরে ফিরে আসছে মঞ্জুর—সেই তার পুরাতন শহরে।

তার আসার আগেই খবরটা এল, উড়ে এল কারণটাও। জানলাম, সবাই জানলাম আমরা বন্ধুরা এই হঠাৎ ফেরার জন্য আমরা ঋণী ফরাসী বিপ্লবের কাছে। ইতিহাসের ঐ বড় ঘটনা সম্বন্ধে বড় করে বলছিল মঞ্জুর—কয়েক শ' ছাত্রছাত্রীর সম্মুখে। বিবৃতির চরম স্তরে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল মঞ্জুরের দেহে, বিপ্লবের দুর্দমনীয় স্রোত যখন প্রচণ্ড একটা বেগে ধাক্কা দিল বর্বর অথচ ক্ষয়িষ্ণু রাজতন্ত্রকে—সেই অবস্থাটার বর্ণনাকালে তার হাত-পা-গলা সব কাঁপছিল থর্ থর্ করে। ধাক্কাটা বোঝাতে গিয়ে নিজের অজান্তেই ধাক্কা দিয়েছিল সামনের স্ট্যাণ্ডটাকে। দেখা গেল স্ট্যাণ্ডটা ফরাসী রাজতন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশী নড়বড়ে, বাহুর ঐ আন্দোলিত ধাক্কায় পড়ে গেল নীচে। সেই সঙ্গে আমাদের মঞ্জুরও। একেবারে শান-বাঁধানো মেঝেতে। ছাত্রছাত্রীরা ছুটে আসেনি কেউ, কে কার আগে এসে টেনে তুলবে সেই প্রতিযোগিতায় কেউ আহত হয়নি, ধাক্কাধাক্কি ও ধস্তাধস্তি হয়নি কোন প্রকার। মুহূর্তখানেক নিশ্চুপ বসে ছিল তারা। তারপর একসঙ্গে হা হা হাসি। দু'জন নাকি কেঁদেই ফেলেছিল—হাসতে হাসতে। ফিট্ হয়ে পড়েছিল একজন। সেদিন আর ঐ কলেজে কোন ক্লাশ হয়নি, হতে পারেনি, হওয়া সম্ভব ছিল না মোটেই।

ব্যাপারটা যে দুঃখের সে আর বলতে! তবু আমরা যারা আবাল্য চিনি মঞ্জুরকে তাদের কাছে এটা অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়। এটা, এমন-একটা ঘটনা, পাওনাই ছিল বলা চলে—আমরা আলাপ করেছি

নিজেদের মধ্যে। মৃদু-মন্দ। যখন আমরা ছাত্র ছিলাম এক সঙ্গে তখন কলেজের বিতর্কসভায় এমন-একটা ঘটনা একবার প্রায় হতে-হতে হয়নি। বিজ্ঞানের অভিশাপ বিষয়ে বলতে উঠে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল আমাদের মঞ্জুর। উত্তেজিত বক্তৃতার মধ্য-পথে দেখা গেল বলার অধীরতা ও বক্তব্যের গভীরতায় সে তোতলাচ্ছে। অল্পপরেই চোখে পড়ল হাত উঠেছে মুষ্টিবদ্ধ, চোখে জ্বলছে বিস্ফোরণ, ঠোঁট রয়েছে ফাঁক হয়ে—কিন্তু কথার কোন নিঃসরণ নেই। তবে কোন বিপত্তি হয়নি, তার আগেই দু'জন হৃষ্টপুষ্ট বন্ধু অতিক্রুত মঞ্চে উঠে অনিচ্ছুক মঞ্জুর আহমদকে একেবারে পাঁজা কোলে করে নামিয়ে এনেছিল। "এতদিনে বুঝি সে আরব্ধ কাজটা সুসম্পূর্ণ করল!"—সকলের মনের কথাটা বলল একজন।

সেদিন দু'জনে উঠেছিল মঞ্চে, দরকার হলে বিশজন উঠত। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবকালীন পতনের সময়তো কেউ ছিল না তার পাশে। ভালোই হয়েছে—ফিরে আসছে গৃহে। তার বহু বন্ধুর ভগ্নাংশ আমরা, আমরা খুশি হলাম। জীবন একঘেঁয়ে হয়ে উঠেছে, কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছি আমরা, মঞ্জুর এসে আমাদেরকে তরতাজা করবে। সেটা সে করত, জানত সে করতে। সে আমাদের হাসাত, আমরা তাকে নিয়ে হাসতাম। বনভোজনে কোথাও গেলে দুটো বিষয়ে খেয়াল থাকত আমাদের ঃ খাদ্যের সঙ্গে যেন থাকে লবণ, আর আমাদের সঙ্গে মঞ্জুর। নিজের দাম সম্বন্ধে সজাগ ছিল, কখনো-কখনো বেঁকে বসত—না ভাই, পয়সা নেই, তখন আমরা হাসিমুখে তার পয়সা দিতাম ভাগাভাগি করে। মঞ্জুর ছাড়া জমাবে কে? হাসাবে কে? হাসবো কাকে নিয়ে?

ঘটনা ঘটার আগেই প্রতিক্রিয়া দেখা দিত মঞ্জুরের। হ্যাঁ বা না লেগেই ছিল। রাগতো, না হয় হাসতো—বসে থাকতোনা কখনো চুপ করে। হাত দুটো ঝুলতো ধনুকের মত বেঁকে, যেন কাজ খুঁজছে। কাজ না-পেলে হাত ঘোরাতো সে—পাহ্‌লোয়ানদের মত করে।

"আদর দিয়ে দিয়ে নষ্ট করেছে"—প্রতিবেশীরা বলত, আত্মীয়-স্বজনেরা জানাত। তা ঐ অভিযোগের মওকা ছিল বৈকি। বাপ

মা'য়ের সাতটা নয় পাঁচটা নয়, ঐ একটাই ছেলে। তদুপরি যখনই তাঁরা শাসন করতে উদ্যত হতেন, মঞ্জুর নিরুত্তাপ বলত সে নিরুদ্দিষ্ট হবে শীঘ্রই। চলে যাবে যেদিকে দু'চোখ যায়। বাবা-মা একসঙ্গে কেঁপে উঠতেন। সংসারে বাবা-মায়ে মিলছিল শুধু ঐ এক বিষয়ে।

অন্য ব্যাপারের মত মেয়ে খোঁজার ব্যাপারেও সে বিস্তর কষ্ট দিয়েছে বুড়ো বাপ-মা'কে। বাবার অবস্থা দেখে অনেকেই সাগ্রহে এগিয়ে আসতেন, কিন্তু দ্রুত পিছিয়ে যেতেন ছেলের অবস্থা দেখে। বাব্বাঃ যা রগচটা! একবার এক মেয়ের বাবা এসেছিলেন মঞ্জুরের আব্বার সঙ্গে দেখা করতে। এই সময়ে পাশের ঘর থেকে মঞ্জুরের সেই অতিবিখ্যাত হাসি—মেয়ের বাবা ভাবলেন ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে হাসছে বুঝি তাঁকে, মেয়ের বাপকেই উপলক্ষ করে। সেই যে তিনি বের হয়ে গেলেন উত্তেজিত পায়ে, আর ফিরলেন না।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষ পর্যন্ত যাকে পাওয়া গেল নাম তার ছায়া নয়—কিন্তু হওয়া উচিত ছিল। সে মেয়ে রাজী হল, কেননা তার কোন মত বা অমত ছিল না। মতামত তৈরী হল না বিবাহের পরও। মঞ্জুর যা বলে তা-ই। যাবে বললে যাবে না, বল্লে না। এ নিয়েও তপ্ত হয়ে উঠত আমাদের বন্ধু। দোষ দেয়া যায় না। কম চেষ্টা করেনি স্ত্রীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ঘটাতে। উপদেশ, পরামর্শ, অনুনয়বিনয়। "এমনকি পায়ে ধরাও বাকি রাখিনিরে ভাই," টেবিলে মুষ্ঠ্যাঘাত করে জানিয়েছে সে, প্রীতিভাজনদের। স্ত্রীকে ধমকেছে, তার উপর রাগ করেছে। উপরে তুলে ছুঁড়ে দিয়েছে। কিছুতেই কিছু হবার নয়। "ছায়ার সঙ্গেতো আর কুস্তি লড়া যায় না।" অত্যন্ত সার্থক ছায়া নামটা ওখান থেকেই চালু।

এতদিনে সে আসছে। ফরাসী বিপ্লব কম ঘটনঅঘটনপটীয়সী নয়। প্রথম দর্শনে আলোচনাটা কেমন হবে সেটা জানা ছিল। বিগত পিতার উদ্দেশ্যে বাক্য ব্যয় হবে বেশ কিছুক্ষণ। "সর্বনাশ করে রেখে গেছেরে ভাই, সর্বনাশ করে রেখে গেছে। কোনদিন শাসন করে নি।" অভিযোগ লাফিয়ে উঠবে ছায়া বেগম সম্পর্কেও। সবাই মিলে আমাকে ডোবালো—কেউ শাসন করল না কোনদিন।

আগের অভিজ্ঞতা ছিল, কাজেই জীবনে বন্ধন ও শাসনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু মূল্যবান কথা সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়েছিলাম মনের মধ্যে, যাতে অপ্রস্তুত না-হতে হয়। কথার পিঠে কথা না বললে আবার খুব অসন্তুষ্ট হয় মঞ্জুর; এমনভাবে তাকায় যে মনে হয় নাস্তাপানি যা খাইয়েছে সেটা অপব্যয় হয়েছে ওর। ছায়া-ভাবীর প্রসঙ্গ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর চরিত্রে স্ত্রী'র প্রভাব সম্পর্কে যা বলব তাও প্রস্তুত করে রাখলাম।

সেদিন বর্ষণ ছিল বাইরে। ভেতরে আমরা দু'বন্ধু। অন্যদের আসার কথা ছিল, তারা আসেনি বর্ষণের কারণে। আমি প্রসঙ্গ উত্তোলন ও উত্থাপন করছি, আর তাকিয়ে থাকছি প্রত্যাশা নিয়ে। ঘা দেবে কথার উপর, ফিরিয়ে দেবে আঘাত করে। কিন্তু না, কোন জবাব নেই। কোন কথারই কোন জবাব নেই। মঞ্জুর যেন মিলে গেছে, মিশে গেছে প্রকৃতির প্রায়-নিস্তব্ধতার সঙ্গে। সে যেন পেছনের দেয়ালটার মত, সামনের টেবিলটার মত। কিন্তু দেয়ালরা বা টেবিলেরা শোনেনা কথা, তাদেরকে সামনে রেখে তাই অনর্গল বলা চলে কথা।

অথচ মঞ্জুর শুনছে! সেটা বোঝা যায় বর্ষণের মাঝে বিদ্যুৎস্ফূরণ দেখে। হাসছে সে মাঝে মাঝে। যেন অন্ধকার ঘরে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলে-ওঠা। কিন্তু ছবি? ছবি কই? ছবিটাতো দেখছি না। কথার কি প্রতিক্রিয়া হল সে তো জাবার কোন উপায় নেই। প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, আছে হাসির ঐ বিদ্যুচ্ছটা, হাসি আছে কিন্তু কৌতুক নেই। কৌতুক-বিহীন হাসি যে এত কঠিন, এমন দুঃসহ হতে পারে আগে জানি নি কখনো, কোনদিন। এতকাল ওকে নিয়ে আমরা হেসেছি, এবার হাসছে নাকি আমাকে নিয়ে? অস্বস্তির দুরন্ত পোকাগুলো দেখি মাথার মধ্যে লাফাচ্ছে বিশ্রামবিহীন।

ভীষণ মুস্কিলে পড়া গেল। অনেক কটু কথা ভাবলাম বসে বসে ওকে দেখে, টাক পড়ছে মাথায়, শরীরের মধ্যপ্রদেশ কেমন না-হক স্ফীত, পা-গুলো লিকলিকে। এতকাল চোখে পড়েনি, ওর অবিরাম হাসিতে ঢাকা পড়েছিল। পানি সরে গেছে—দেখ এখন উদাম চৌবাচ্চাকে। দেখ সে, নোংরা, সেঁৎসেতে, কাদা-কাদা। কিন্তু তবু

অস্বস্তি কমে না। সন্দেহটা থামে না। আশা নিয়ে দরজার দিকে ঘনঘন তাকাচ্ছি—কোন-একটা প্রসঙ্গ ঢুকে পড়ুক না হঠাৎ করে। আর কিছু না হোক ওর ছেলে-মেয়েরা দৌড়ে আসুক না এক্কা-দোক্কা খেলতে খেলতে। জড়িয়ে ধরুক না বাবাকে। কিন্তু কেউ এলনা। আমি-ই বেরিয়ে এলাম, রুমাল দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে।

শোনা গেল অনেকেরই ঐ একই অভিজ্ঞতা। অনেক আশা নিয়ে গেছে, ফিরে এসেছে চূড়ান্ত হতাশ হয়ে। সবাই বলল এটা চরম বিশ্বাসঘাতকতা, এ যেন অতিজরুরী কাজে বন্ধুর আপিসে যেয়ে দেখতে পাওয়া, বন্ধু নেই, বদলি হয়ে গেছে কাউকে না-জানিয়ে, তার চেয়ারে বসে আছে গোমড়ামুখো চেহারার কে-একজন। খবর রটে গেল যে, যে-মঞ্জুরের পতন ঘটেছিল কলেজের মেঝেতে সে আর উঠে আসেনি। উঠেছে অন্য একজন। ডঃ জেকিলকে হটিয়ে বেরিয়ে এসেছে মিঃ হাইড। যে উঁচুগলায় হঠাৎ করে হাসে না, সবসময় শুধু হাসি-হাসি মুখ করে বসে থাকে। মিঃ হাইড হয়ত ভেতরেই ছিল, কিন্তু মঞ্জুর সতি সত্যি হাইড করেছে—লুকিয়ে গেছে, নিজের ভেতরে, অন্ধকার গুহার কোন দুর্গম প্রত্যন্ত কোণে।

ছায়া বিবি মৃদুমন্দ নাকি বলতেন আগে—বাড়িটায় একেবারে হাট বসিয়ে রেখেছে। এখন কিছুটা জোরের সঙ্গেই বলছেন, এই প্রশান্তি একেবারেই অসহ্য! কিছু বলেন না গৃহকর্তা। হ্যাঁ না নেই—শুধু নিশ্চুপ হাসি। ফেরার পথে ট্রেনে যা ঘটেছিল তার কথা বলেন মহিলা উদাহরণ স্বরূপ। রাজ্যের ভিখিরী ও ফেরিওয়ালাতো উঠেছে ট্রেনে—অন্য যাত্রীর সবাই হে হে করছে—'নেমে যাও,' 'চাই না', নয়ত 'এদিকে এসো।' মঞ্জুর আহমদ নিশ্চুপ- হ্যাঁ-ও বলেন না, না-ও বলেন না। ফেরিওয়ালারা ভাবছে এই সাহেব নিশ্চয়ই জিনিস কিনবে, ভিখিরীরা ভাবছে নির্ঘাত পয়সা দেবে। চরমভাবে বিভ্রান্তিজনক মঞ্জুরের সাম্প্রতিক হাসি, যেন নামের সঙ্গে তাল রাখছে। একেবারে ছেঁকে ধরেছিল লোকগুলো। এই ঘটনা রোজ ঘটছে—ছেলে-মেয়েরাও বলল।

শহরময় রটে গেছে সেই খবর। মঞ্জুর ফেরেনি, তার চেহারা নিয়ে ফিরেছে অন্য-এক মানুষ। দেখা গেল যে-মঞ্জুরকে সবাই খুঁজে

বেড়াত এখন সকলে তাঁকে এড়িয়ে চলছে। অনিশ্চিত অপরিচিত অন্ধকারকে কে চায় বন্ধু হিসাবে? কে করে নিতে পারে আপন বান্ধব?

এমনকি এও ভালো হত যদি ডুকরে কেঁদে উঠত মঞ্জু, আমরা ছুটে যেতে পারতাম, বন্ধুরা, বলতে পারতাম, ভয় কি, এই তো দেখ আমরা আছি। আমরা নিশ্চিত জানতাম আমরা কোথায় আছি।

কিন্তু এর কোনটাই করবে না সে, আমি জানি। আমার মনে হয় নীরবে সে অভিযুক্ত করেছে সকলকে, জীবনকে, জগৎকে, বন্ধুকে, আত্মীয়-স্বজনকে, সর্বোপরি তার অতিবেশী-ভালবাসার ফরাসী বিপ্লবকে। আমরা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি সকলে, সবাই, একসঙ্গে। তার সামনে।

যেন না দেখা হলেই ভালো, যেন বেঁচে যাই। অভিযুক্ত হওয়ার হাত থেকে।

অথবা হতে পারে সে করুণা করছে। এতদিনে।

সৌজন্যে

আমার হাত কাঁপে।

'হ্যাঁ' বলতে তোকে আমার হাত কেঁপে ওঠে। আগে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গই কাঁপত, চুলের গোড়া, চোখের মণি, মস্তিষ্কের কোষ সহ হাত পা গাল ঠোঁট সব কিছুতেই ঝড়ের নাচন লাগত। এখন শুধু হাত দুটো কাঁপে।

ব্যাপারটা প্রথমে টের পাই স্কুলজীবনে। ভূগোলের পরাক্রান্ত শিক্ষক তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা-শেষে যখন জিজ্ঞেস করলেন কামস্কাটকা কোথায়, তখন ভুল জবাব করেছিলাম। আর তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি প্রহার করেছিলেন, বলেছিলেন, "ক্লাশে বসে বসে শুধু শয়তানি! বল, শয়তানি করবি আর, বল!"—তাঁর হাত ও মুখ সমানে চলছিল। "জী না"। "মনোযোগ দিয়ে পড়বি?" "জী"।

তা পড়েছিলাম বোধ হয়, নইলে পাশ করলাম কি করে? কিন্তু যখন ডাষ্টার ঠুকছিলেন আমার মাথায় তখন দেখি অন্য এক মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। পানিতে চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে, স্যারের ক্রুদ্ধ চেহারাটাও ঠিকমত দেখতে পাচ্ছিনা। অথচ ঠিক দেখছি সেই মূর্তিটাকে। আমারি মতন চেহারা, কিন্তু আমি তাকে আগে কখনো, কোনদিন দেখিনি। তার চেহারা দেখলে ভয় লাগে, কথা শুনলে আরো। সে যেসব কথা বলছিল তদনুযায়ী যদি কাজ করতাম তা'হলে স্যার ও আমার উভয়ের জীবন-ইতিহাসই সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে লেখা হত।

বয়স বাড়ার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ওটাও দেখলাম একটা, "জী হ্যাঁ' বলতে গেলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর ঐ কেঁপে ওঠা। যত

বেশী বিনয় থাকে, হাসি থাকে মুখে, যত বেশী নম্রস্বরে বলি 'জ্বী', তত বেশী চাঞ্চল্য চলে মনের ভেতরে। ততবেশী লম্ফঝম্ফ।

অনেক সময়ে পা চেপে রাখতে হয় টেবিলের নীচে, হাত আটকে রাখতে হয় টেবিলের হাতলে—সে এজন্য নয় যে ভয় পেয়েছি, তার অন্য কারণ—পাছে 'হ্যাঁ'-র পেছনের 'না'-টা হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ে। ওকে বিশ্বাস নেই। বিশ্বাসঘাতকতা আছে তার স্বভাবে। তবে আমি দমন করেছি।

কাজটা সোজা ছিলনা। প্রথম দিকে ভীষণ কষ্ট হত। দাঁত সে কিড়মিড় করত—সেটাকে কাবু করা গেল। পা ব্যগ্র অস্থির হয়ে পড়ত—খুব কদাচিৎ পলায়নের জন্য, অধিকাংশ সময়েই ভিন্নতর কাজের আগ্রহে। তাদেরও দমিয়ে দিলাম। কিন্তু গলাটা দেখি কিছুতেই বশে আসে না। 'জ্বী হ্যাঁ' বলার সময়ে বিপরীত শব্দে নানাপ্রকার বিপর্যয়ের হুমকি দেয়, কখনো ছুটে যায় বেরিয়ে যাবে বলে। প্রায়ই আমার বিনীত 'হ্যাঁর' সঙ্গে গুতোগুতি ধস্তাধস্তি শুরু করে দেয়। এইজন্য 'জ্বী হ্যাঁ' আমি খুব তাড়াতাড়ি বলি, ঠোঁট ফাঁক হয় কি হয় না। বিদ্রোহীদের বিশ্বাস কি! আবার কখনো দেখি সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে ঐ মস্ত 'না'টা গলাতে কেবলি সুড়সুড়ি দিচ্ছে। তখন ভারি কষ্ট হয় হাসি সামলাতে। 'হ্যাঁ'টা বলা হয়ে গেলে মনে হয় ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

অমন যে গলা সেও শায়েস্তা হয়েছে। আর দীর্ঘদিনের ব্যবহারে মুখের উপর মুখোশই এমন পুরু, পাকা ও পোক্ত হয়ে গেছে যে, আসল মুখটা এখন স্মৃতিতেও আসতে চায় না। বিনীত 'জ্বী হ্যাঁ' এখন একমাত্র মুখশ্রী। এবং নিরীহ বলে বাইরে আমার ভীষণ সুনাম।

কিন্তু হাত! হাত নিয়েই গণ্ডগোল। তারা অস্থির হয়ে পড়ে। নিসপিস করতে থাকে। কিছুতেই শাসন মানে না। আর তাদের ভয়ঙ্কর ইশারায় চোখ গিয়ে পড়ে টেবিলের পেপারওয়েট্‌টার উপর, নিবদ্ধ থাকে বেল কি কলিংবেলের গায়ে। আর যিনি 'জ্বী হ্যাঁ'টা দাবী করে বিস্তর কথা বলছেন টের পাই চোখ আটকে আছে তাঁর শ্বাসনালীর যে-অংশটা ওঠানামা করতে থাকে সেই অংশটাতে। ফিরিয়ে নিই।

কিন্তু ফের দেখি বেয়াড়া চোখ ঐখানে। ভয় হয়, কবে যেন খুনের আসামী হই আমি।

তা'হলে কি কখনো উৎফুল্ল হইনি, উল্লসিত হতে পারিনি 'হ্যাঁ' বলার সুযোগ পেয়ে? উপহার কি উপঢৌকন বা সুখ কি কখনো পাইনি জীবনে? পেয়েছি হয়ত। সবাই যখন পায়।

কিন্তু তাদের কথা মনে নেই, তারা সঙ্গোপনে মিশে গেছে জীবনের সঙ্গে। মনে আছে শুধু সেই 'হ্যাঁ' যেগুলোতে আমার হাত কাঁপে। যে মাসে একটার বেশী দাওয়াত আসে, এসে মাসের হিসাবটাকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে উগ্যত হয় সেই মাসে দ্বিতীয় দাওয়াতটা যিনি নিয়ে আসেন, হোক না সে দাওয়াত বিয়ের, কি বিদায়ের, চায়ের কি ভোজনের— দ্বিতীয় দাওয়াতটা এনে যিনি অতিবিনয়ে বলেন 'যাবেন কিন্তু!' 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই!' বলে তাঁর সঙ্গে হাত মেলানোর সময় তিনি টের পান কি না জানি না, আমি টের পাই যে, হাত আমার খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ধার কি চাঁদা চাইয়েদের কথা না বলাই ভালো।

অথচ 'হ্যাঁ' আমি বলতে চাই। সব সময়েই চাই। বলার আগ্রহে হা করেই থাকি যেন গরম দুপুরে গজাল মাছ। উপকার হোক লোকের। সুখ জুটুক। শান্তি হোক। কখনো-সখনো ভেবেছি গল্প লিখব, আর লিখতে গিয়ে নিজেই অবাক হয়েছি নিজের বদান্যতায়। গল্প শুরু করলেই দেখি নায়ক-নায়িকারা নানান জিনিস চাইতে শুরু করেছে। আমি মিটিয়ে দিই, দিতেই থাকি, দ্বিরুক্তি করি না। যারা বিয়ে চায় তাদের বিয়ে দিয়ে দিই। বিয়ের পরেই দেখি তাদের বাসার প্রয়োজন। দেয়া গেল বাসা। চাকুরিতে উন্নতি চাই। দিলাম তাও। সন্তান চাই। দিলাম পাইয়ে। গাড়ি। খ্যাতি। সব। সবটাতে 'হ্যাঁ' আমার।

গল্প আর থামতে চায় না। জোর করে থামিয়ে তাকে দ্বিতীয়বার পড়ে দেখি, অতিউৎকৃষ্ট রূপকথা কেঁদে বসে আছি। এই বোধ নুর সত্য। হাত-নিসপিস-না-করা 'হ্যাঁ' বোধ হয় শুধু রূপকথাতেই বলা যায়—অনায়াসে ও অহরহ, আর সেইজন্যেই বোধহয় 'হ্যাঁ' বলার

সৌজন্য পালন করতে গেলে এত কষ্ট হয় জীবনে। জীবনে-রূপকথায় দূরত্বের মাপকাঠি ঐটাই।

অবশ্যি আমার সেই সহকর্মীর কথা আলাদা যিনি আমার পাশের টেবিলে বসতেন, এখন ঐ 'জী হ্যাঁ,' 'জী হ্যাঁ' রব করতে করতে কাঁহা কাঁহা চলে গেছেন, রূপকথার নায়কের মত। ভাবতে গেলে মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। এবং আমার সেই বন্ধুরও, যাঁকে দেখলে আমি পালিয়ে বেড়াই, যার সঙ্গে কখনো তর্ক করি না, না-করেও দেখি আলাপটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে একটা অবিরাম কৃচ্ছ্রসাধনা। কেননা, 'না' 'না' 'না' করে আলাপের পথটাকে তিনি বিপদসঙ্কুল করে তোলেন, কখনো দেখি কাঁটা দিয়েছেন বিছিয়ে, কখনো বা খাদ রেখেছেন লুকিয়ে।

নিতান্ত সাধারণ মানুষ বলেই হ্যাঁ-তে আমার এত ভয়। 'জী হ্যাঁ' যে সৌজন্যের ব্যাপার এতো প্রায় ভুলতেই বসেছি।

দরজায় ধাক্কা

প্রথম যেদিন অর্থোপার্জনে উদ্যত হয়েছিলাম সেটা অনেক দিন আগের কথা, তবু তার কথা আমার খুব মনে আছে। অত্যন্ত উত্তেজিত-হৃদয় নিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল এক ভদ্রলোকের টেবিলের সামনে। তিনি কিছুতেই মুখ তোলেন না। আমি নিজের পা নাড়াচাড়া করলাম, কাশি দেয়া উচিত হবে কি না তাই বিবেচনা করে দেখলাম। শেষে দেখি, কপাল! মুখ তুলে তাকিয়েছেন। তাকালেন কিন্তু দেখলেন না। বৃত্তান্ত শুনলেন কি শুনলেন না, বললেন —"একটু ঘুরে আসুন।" তারপর খাতার উপরে হিজিবিজি অংকে পুনরায় তিনি নিমগ্ন হলেন। বেরিয়ে এসে অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালাম। লোকজনের ঘোরাফেরা দেখছি—এই সময়ে হঠাৎ একটা জীবনদর্শনের উদয় হল ভেতর থেকে—সংসারে লোক আছে দু'রকমের, একদল ঘোরায়, অন্য দল ঘোরে। পরে একটু সংশোধন করেছি—যারা ঘোরে তারা কখনো কখনো ঘোরায়ও, এবং ঘোরায় যারা তাদেরকেও ঘুরতে হয়, কখনো কখনো।

আর এই যে অবিরাম ঘোরাঘুরি চলছে এর দরুনই সময় নেই অসময় নেই, ধাক্কা পড়ে আমাদের দরজায়। দরজায় যখন ধাক্কা শোনেন তখন চিত্তে কোন ধরনের চাঞ্চল্য হয় আপনার শুনি? উদ্বেগ, আতঙ্ক, প্রত্যাশা? প্রত্যাশা থাকে বৈকি—বিশেষ লোক দরজায় কখন টোকা দেবে সে-আশায় কান খাড়া আমরা রাখি নিশ্চয়ই। কিন্তু ভুল লোকরাই আসে সাধারণত, এমনকি ঐ প্রত্যাশার সময়েতেও। মিষ্টি কি উপঢৌকনের বোঝা নিয়ে কেউ কখনো আসেনি এমন নয়, কিন্তু ভিন্ন ধরনের বোঝা-ই আসে বেশী। দেখি কেউ নিয়ে এসেছেন অভিযোগ,

কেউ অভিমান, কেউবা অনুরোধ। সবচেয়ে কঠিনহৃদয় তিনি যিনি আনেন উপদেশ।

শেকস্‌পীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকে বৃদ্ধ রাজা যে-দৃশ্যে খুন হলেন তার পরের দৃশ্যেই শুনি প্রাসাদের দরজায় কারা ধাক্কা দিচ্ছে। অর্থাৎ কিনা মৃত্যুর এখতিয়ার শেষ হয়েছে, দরজায় ধাক্কা দিয়ে এখন জীবন এল সদলবলে। আপনাদের কি অভিজ্ঞতা জানি না, কিন্তু আমার কাছে দরজায় ধাক্কা আসে উল্টোরূপে—মৃত্যুর কলেবর নিয়ে। ধাক্কা শুনলেই বুকটা ধক্ করে ওঠে, উৎকণ্ঠা জাগে গলায়, আর শরীরটা মনে হয় ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আর যখন দরজা খুলে প্রাণপণে বলি—'আসুন' 'আসুন' তখন সঙ্গে সঙ্গে দম্ করে অন্য একটা দরজা বন্ধ হযে যায়। —মনের দরজা।

যাঁরা প্রিয়জন দরজা খুলে তাঁদের পেলে উল্লসিত হই। কিন্তু তখন 'আসুন, আসুন' করি না। চেঁচিয়ে বলি, 'আরে!' আর তাঁরা অতি-অনায়াসে সদর দরজা পার হয়ে মনের দরজার ভেতর ঢুকে পড়েন। সব দরজা খুলে আমরা আহ্লাদ করতে বসি। কিন্তু ঐ 'আরে!' বলার ক'জন লোকইবা আছে দুনিয়ায়—সুহৃদরা ক'দিনই বা আসেন আমার দরজায়? প্রায় সব সময়েই তাই 'আসুন, আসুন' চলতে থাকে। আর ঐ যে ভেতরে নিয়ে এলাম আগন্তুককে তখন বুঝতে পারি যে, দরজা জিনিসটা আমরা লোকে আসবে এইজন্য তৈরী করিনি, বরং যাতে লোকেরা আসতে না-পারে সেই জন্যই বানিয়েছি, দেখতে পাই যে, ঐ দরজাতে দাঁড়িযেই আমি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছি। এক ভাগ অতিকষ্টে 'আসুন, আসুন' করছে, আর অন্যভাগ—সেটি পাষণ্ড একট', জানোয়ার একজন—পারে তো ভদ্রলোকের ঘাড়েই ধাক্কা দেয়!

দরজার ভেতরে এনে আপ্যায়নের কাজটা কঠিন নয়। নাস্তাপানি অন্যরাই জোগাড় করে। খরচপাতি হয়, গঞ্জনাও ঘটে, কিন্তু তা নিয়ে মুস্কিল আসল নয়। আসল মুস্কিল ঐ নাস্তাপানির আগের ও পরের ঘটনায়।

কারো সঙ্গে আলাপের প্রসঙ্গই জোটে না, কারো মুখে দেখি প্রসঙ্গের খই ফুটছে। যেমন ধরুন, রবিবার হলেই ভয় হয় একজনের কথা ভেবে।

ওঁর সঙ্গে সাধারণত ওঁদের এলাকার পানি সরবরাহের অনিয়ম নিয়ে আলাপ করি আমি। এই সেদিন জানিয়ে গেলেন নতুন একটা ট্যাঙ্ক তৈরী হওয়ায় পানিকষ্ট ঘুচেছে। যে-কোন রবিবারে আসতে পারেন, এলে আমি কি নিয়ে আলাপ করি? ওই এলাকার বিদ্যুৎ-ব্যবস্থার অনিয়মের উপর মনে মনে ভরসা করে আছি, এখন সে সহযোগিতা করলে হয়। কোনমতে আলাপ তো চলে, ওদিকে ভেতরে ভেতরে চাপা এক উৎকণ্ঠা। কখন তিনি তাঁর বোঝা নামান। বোঝাটা দেখতে পাচ্ছি মানসচক্ষে, কিন্তু তার ভেতরে কি কি আছে আল্লা মালুম। আর বোঝা যখন খুলতে থাকেন তখন আমার ভেতরে পশুটা—যাকে কোনমতে মনের দরজার ভেতরে ঠেলে দিয়েছি—সে ওঠে লম্ফ দিয়ে, কি তর্জন-গর্জন, দরজাটা ভেঙ্গে ফেলে আর কি।

যে-ভদ্রলোক দুনিয়ার যে সামান্য অন্যায় ভোগ করেছেন সে-বিষয়ে বলতে থাকেন, শুনি ভেতরের পশুটা তাঁকে বলছে—"হয়েছে হয়েছে, এবার আসুন।" কখনো বলে, "মাফ করবেন, আপনার কথা শুনে ভীষণ মাথা ধরেছে। একটি ট্যাবলেট খেয়ে আসছি।" কখনো আর্তনাদ করে ওঠে, "আমার ক্ষিদে পেয়েছে, আপনি এবার উঠুন তাহলে, আমি ভাত খাবো।" যে-পরিবারের স্ত্রী সেলাইয়ের খাতা এবং স্বামী আমার অনেক-কষ্টে-জোগাড়-করা অর্ধেক-পড়া গল্পের বইটি তুলে নিলেন, আর যাঁদের পুত্রকন্যারা ফুলের টব ও পানির গ্লাসে মিলিয়ে টাকা পঁচিশের নিকাশ করে গেল সেই পরিবারের স্ত্রীটি যখন অনায়াসে বলেন, "ছেলে-মেয়েদের ভাই আমরা ধমকাধমকি করি না। মনস্তত্ত্বের বইতে পড়েছি বকাঝকা করলে ওদের পরকাল ঝরঝরে হয়ে যায়" তখন আমার মনের পশুটা কি করতে চায় সেটা ভদ্র-ভাষায় প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। মাফ করবেন।

কিন্তু সদর দরজার ভেতরে এবং মনের দরজার বাইরে বসে পাশবিক তর্জন-গর্জনের মধ্যে মাথা ঠিক রেখে সৌজন্য-করা এটা চাট্টিখানি কথা নয়—এ আমি বলবই। যখন অতিথি বললেন, "এবার তা'হলে উঠি ভাই," তখন যেন নিতান্তই অনিচ্ছার সঙ্গে উঠলাম আমি।

ওদিকে মনের পশুটা চীৎকার করে বলতে চাচ্ছে, 'আসুন, আসুন'। তখন টের পাই যে, সৌজন্য আসলে কণ্ঠস্বরের ব্যাপার, কিন্তু হায় কণ্ঠস্বরটা স্নায়ুর সঙ্গে যুক্ত। তাই অতিথি-বিদায়ের বিগলিত মুহূর্তে আরো একটি জীবনদর্শনের উদয় হয় আমার মধ্যে, সৌজন্য অর্থই স্নায়বিক যুদ্ধ, সভ্য-ব্যবহার মাত্রেই স্নায়বিক আক্রমণ।

'আসুন, আসুন' তো অনেকেই বলে। যখন দরকার নেই, দিব্যি হেলেদুলে পথ হাঁটছেন, সেই সময়ে রিক্সাওয়ালা 'আসুন, আসুন' করে পারে তো পাঁজা কোলে করে তুলে নেয়। গোয়ালন্দে নেমে দেখছি হোটেলওয়ালারা চ্যাং দোলা করে নিয়ে যেতে চায় ভাত খাওয়াতে, মুখে ঐ আসুন, আসুন'। সব্জিওয়ালারও ঐ একই ধ্বনি। এসব ক্ষেত্রে পরিশ্রম যা হয় তা ওদের ফুসফুসের—স্নায়ুর উপর চোট পড়ে না। কিন্তু যখন আপনি নিজের বাড়ির দরজায় আপনার ভেতরের উন্মত্ত পশুটিকে শায়েস্তা করছেন তখনকার ব্যাপার আলাদা।

অথবা যদি এমন হয় আপিসে বসে জরুরী কাগজপত্র নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন, চাকরি এখন-তখন, এই সময়ে কেউ এসে বললেন, "কই, চা আনুন", তখনকার 'আসুন, আসুন' সেটা স্নায়ুমূল ধরে টানাটানি। বাসে কি ট্রেনে অতিকষ্টে একটা আসন জোগাড় করে বসেছেন কি বসেননি এই সময়ে দেখেন ঘাড়ের উপর পরিচিত অথবা শ্রদ্ধেয়জন, তখনকার দাঁড়িয়ে ওঠা এবং নিজের জায়গায় বসতে-বলা সে কিছু সোজা কাজ নয়—বিশেষ করে যখন ভয় থাকে যে, আপনার অনুরোধ তিনি ফেলে দেবেন না।

কিন্তু আমি ভাবি নৈতিক বল বস্তুটা কী অসম্ভব বলশালী, নইলে যে-আমি সৌজন্য করি সে তো অতিক্ষীণস্বাস্থ্য, সে কি করে ঐ ভীষণ পশুকে চোখ রাঙিয়ে বশ করে! এ বোধ হয় সেই শক্তি যার জোরে অতিদুর্বল গৃহস্বামীকেও দেখা যায় জবরদস্ত চেহারার অপহরণজীবী চোরকে অনায়াসে মারধোর করছেন। কিন্তু সারাক্ষণ ঐ চোর ঠেঙানো সে-এক বিড়ম্বনা, যাই বলুন। ভেতরের পশুটা কিছুতেই মানুষ হল না। তবে একটা ব্যাপার আছে। যখন হাত-বাড়িয়ে

কাউকে বলি 'আসুন, আসুন' তখন নিজেই নিজের অভিনয় দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাই আমি। মনে হয় মঞ্চে কি পর্দায় অভিনয় না দেখলেও চলবে। এই অভিনয় করতে করতে একদিন মুখোশই মুখ হয়ে দাঁড়াবে এমন আশা খুবই করছি আমি।

অবসরে

নাটকের নায়িকা যখন বলছে, "এই তোমার কাজ! তুমি খল, তোমাকে আমি ঘৃণা করি. দাও ফেরত দাও, দাও আমার ছবি!" তখন নায়ক দেখা গেল ভষীণ সপ্রভিত, প্রফুল্লই যেন, বাঁকা হাসির ঝিলিমিলি খুলে ধরেছে, আর বলছে, "এই ছবিতো কেড়ে নিলে শ্রীমতি, কিন্তু সেই ছবিটা কি করে নেবে যেটা আমি মনের ভেতরে গড়ে রেখেছি, কল্পনার দামী দামী সব রং চড়িয়ে?"

—এই যে নিজে নিজে একান্তে গোপনে গড়ে তোলা, একই সঙ্গে স্রষ্টা ও সম্রাট হয়ে বসা—এটা অবসরের কাজ। কাজের কাজ যখন করি তখন আমরা সকলেই সকলের মত, কিন্তু অকাজের বেলায়, অবসর-সময়ে, আমরা প্রত্যেকে বিভিন্ন। তখন আর আমাদের পরিচয় এই নয় যে, আমরা কেউ দপ্তরে কাজ করি, কেউ ক্লাসে, কেউ কারখানায়, কেউ বা ক্ষেত-খামারে—তখন আমরা প্রত্যেকে অনন্য ও অসামান্য, তখন আমরা স্রষ্টা ও সম্রাট। বলা হয়েছে সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম ফসল ফলেছে অবকাশের ক্ষেত্রে। সেটা খুবই খাঁটি কথা।

আমার অবসর-বিনোদনের কাজ সমাজের আর পাঁচজন মানুষের যে বিশেষ উপকারে আসবে তেমন কোন নিশ্চয়তা নেই—এ কাজটা অতিরিক্ত, কিন্তু তেমন অতিরিক্ত যা না থাকলে জীবন অর্থহীন, সভ্যতার প্রশ্ন অবান্তর। একটা সভ্যতা-সংস্কৃতির মানসলোকের গোপন খবর জানতে হলে তার জনগোষ্ঠির অবসর-বিনোদনের উপায় ও উপকরণগুলোর খোঁজ নেয়া একটি অত্যুৎকৃষ্ট পন্থা। প্রাচীন গ্রীক-সভ্যতার প্রশংসায় লোকে পঞ্চমুখ—সেদেশের মানুষ যে অবসর পেলে খেলাধূলা করত, যখন তারা খেতে বসত তখন যে খাবার শেষ হবার অনেক পরেও তর্কা-

তর্কি চলত, তারা যে উন্মুক্ত আকাশের নীচে জমায়েত হয়ে নাটক দেখতে ভালবাসত, এসব খবর যদি জানা যায় তা'হলে স্থাপত্যে, দর্শনে, কাব্যে, গণতন্ত্র-চিন্তায় তাঁদের মস্ত মস্ত অবদান দেখে অবাক হবার কিছুই থাকে না।

আসলে, অবসরযাপনটা আলস্যের ব্যাপার কিছুতেই নয়। এমনকি যিনি অবসর-বিনোদন করেন বসে বসে আকাশ দেখে, নানান রকম অলস চিন্তা করেন, বলা যাবে না তিনি আলস্য-প্রকাশ করছেন। অন্যদিকে আবার যাঁর কাজ নেই তাঁর অবসরও নেই। বেকার যিনি, যিনি কাজ খুঁজেছেন, কাজ নেই বলে বিব্রত হচ্ছেন তাঁর কাছে অবসর-বিনোদনের কথা বলা স্থূল রসিকতা করা।

কাজের নদী থাকলেই অবসরের চরই বলুন আর দ্বীপই বলুন, সেটা জেগে ওঠে। এমন জাঁদরেল অফিসারকে আমরা সবাই চিনি যাঁর সমস্তটা জীবন কেটেছে কাজের অবিরাম ঘূর্ণিতে। যিনি ঐ কাজের দাপটে বসতবাটিকে তটস্থ রেখেছেন; আর বলেছেন অহরহ কবে যে অবসর পাবেন, বাঁচবেন হাঁপ ছেড়ে, বাতাস লাগবে হাড়ে। সত্যি সত্যি অবসর যখন এল, দেখা গেল প্রথম কিছুদিন সশব্দে অবকাশযাপন করলেন, তারপরেই ছটফট করা, বিরক্ত হওয়া, যেন ভীষণ একটা বেকায়দায় পড়েছেন। শেষে তড়িঘড়ি একটা চাকুরি খুঁজে নিয়ে নিজেও বাঁচলেন, অন্যদেরও বাঁচালেন।

কাজ ও অবসর সমান্তরালে চলুক--একে অপরকে রক্ষা ও পুষ্ট করুক এটাই বাঞ্ছনীয়। একটানা কাজের মধ্যে আমরা নিশ্চুপ থাকি, কিন্তু সেই নিশ্চুপতায় একটা উন্মত্ততা আছে। নিশ্চুপ উন্মত্ততা, যেটা টের পাওয়া যায় কাজটা সরে গেলে। যে-মানুষ চেয়ারে বসে হামেশা পা দোলাচ্ছে, অনেককাল দুলিয়েছে, তাকে হঠাৎ থামতে বললে তার যেমন অস্বস্তি হয়, একটানা কাজের মানুষেরও তেমনি। বিপদে পড়েন অখণ্ড অবসরের ভেতর আটকা পড়লে। কিন্তু অবকাশেই আমরা সহজ হই, স্বাভাবিক হই। কাজ জিনিসটা সোজা নয়, কিন্তু অবসরযাপন অনেকসময় কাজের চেয়েও দুরূহ। যেমন বিত্তবানের পক্ষে বিত্ত অর্জন করার চেয়ে চিত্তকে বশ করা অনেক শক্ত দায়িত্ব।

অবশ্যি অবসর-বিনোদনে বিলাসের প্রশ্রয় আছে। এমনকি ছিপ ফেলে ফাৎনার দিকে যে অবিচল চেয়ে থাকবেন তার জন্যও বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়। কিন্তু জীবনের এই বিলাসটাকে উপেক্ষা করা সোজা। এবং আমরা তা করিও। 'হবি' জিনিসটা যে থাকা আবশ্যক সেটা ফর্ম-পূরণ করতে যেয়ে টের পাই। ঐ পর্যন্তই, এর বাইরে বাজে কাজের চর্চায় আমাদের নীতিবোধের নিষেধ থাকে। বয়স্ক লোক ডাকটিকিট সংগ্রহ করছে এ-রকম ধরনের খবর পেলে আমরা না হেসে পারি না। অল্পবয়সে যে গল্প-কবিতা লিখছে তার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকি যে, সে গোল্লায় গেছে। বাগান করার কাজ তোলা থাকে চাকুরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত-জীবনের জন্য। যে-মেয়ে নতুন রান্নার পরীক্ষা করবে বলে আবদার করছে, বাড়ীসুদ্ধ লোকের সে ধমক খায়।

কাজ যদি হয় জীবিকার, অবসর তা'হলে জীবনের। অবসর দিয়েই জীবনকে চেনা যায়, জীবনের অভাবকেও। বড় বড় মনীষীরা জীবিকার জন্য মেধাকে খাটিয়েছেন, কিন্তু জীবনের জন্য রেখেছেন মনীষাকে। বড় অবদান আমরা সকলে রেখে যাব না নিশ্চয়ই, রাখলে বিপদ ছিল, সঙ্কুলান হত না স্থানের। কিন্তু জীবনকে সুখী ও স্বাভাবিক করার জন্য নিজের মতন করে অবসরযাপন করব না কেন? উদ্বেগ, গ্লানি ও ক্লান্তিকে সরিয়ে ডিঙিয়ে নাটকের ঐ নায়কের মত নিজের-গড়া রাজ্যে আশ্রয় নেব না কেন? আর কিছু না পারি, একটা বই খুলে বসতে দোষ কি।

ঘুঘু

আমি কে? কে আমি?—এই প্রশ্ন নিজেকে নিভৃতে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি। জানতে চেয়েছি কোন্ চেহারাটা আসল, কোন ধরনটা সত্যিকার।

এক ভদ্রলোক আছেন যাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমি নিজেকে দেখতে পাই। তিনি অতিবিনয়ী। যেন বিবেচনা ও শুভেচ্ছার হারুনুর-রশীদ পরিচিত মানুষের ছদ্মবেশ ধরে পথভ্রমণে বেরিয়েছে। দূর থেকে সালাম-আলেকুম করেন, হাসেন বিগলিত হয়ে। আর তাঁর সামনাসামনি দাঁড়ালে মনে হয় মসৃণ একটা আয়না তুলে ধরেছেন। ঐখানে আমি নিজেকে দেখতে পাই। দেখে ঘেন্না হয়। কেমন ভদ্রতাবিহীন আমার ভাব-ভঙ্গী, কুৎসিত কদর্য আমার আচরণ। কিন্তু আত্মদর্শনের ঐ বিচলিত মুহূর্তে মনের ভেতর একটা হিংস্র সন্দেহ ওঠে লকলকিয়ে—ঘুঘু দেখছি না তো কোন? ঘুঘুরা কোথায় না আছে?

আমি তাঁকে এড়িয়ে চলি। সে-আয়নায় মুখ দেখে সুখ কৈ যে কেবলি অস্বস্তি এনে দেয়? তাছাড়া ঘুঘু ডাকছে, তাঁকে খুঁজছি, অথচ দেখতে পাচ্ছিনা এই অবস্থাটা কি আরামদায়ক? আমার ধারণা ঐ জন্যেই ঘুঘুকে আমরা ঘুঘু বলি, ঐ যে গাছে ডাকছে, শুনছি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছিনা, থাকছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে—ক্ষুদ্রের এই বুড়ো-আঙুল-দেখানো নিনাদিত আস্ফালন, এটা অসহ্য।

একই কারণে ইঁদুর কি শেয়াল, অথবা গভীর জলের মাছ—সবার ওপরেই ক্রোধ আমাদের। বস্তুতঃ ঘুঘুকে আমরা, বাংলাভাষীরা, যত চিনেছি আর কেউ তত চিনেনি। অন্যভাষায় যে-ঘুঘু শান্তির প্রতীক আমাদের ভাষায় সে-ঘুঘুই অশান্তির চিহ্ন। বাংলা ভাষায় সেই কবির

শক্তি সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ ঘুঘুকে যিনি কাব্যে সম্মানিত করেছেন—আরও অনেক কিছুকেই সম্মান দিয়েছেন। ভেরেণ্ডাকে, আকন্দকে, পেঁচাকে। কিন্তু ঘুঘুর ঘুঘুত্ব ঘোচানো সে-বড় কঠিন কাজ!

সব দেশের মানুষদের মতই যারা আমাদের উপকার করে তাদের নিয়ে আমরা বেশী মাথা ঘামাই না। কুকুর, বিড়াল বা কাককে দিয়ে আমাদের তত কথা-উপকথা কথকতা নেই যত আছে শেয়াল, ইঁদুর ও ঘুঘুকে নিয়ে। আমার ধারণা পুরুষদের চাইতে মেয়েরাই বেশী ঘুঘু, ঘুঘুর মতই নিরীহ অথচ—। কিন্তু সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

আমার এই সন্দেহের ঘুঘুকে দেখা মাত্রই আমি লম্বা দৌড় দিই। যেই দেখি দূরে যাচ্ছে তাঁর মাথা, সেই মাথায় অল্পচুলের দীর্ঘ কারুকার্য, অমনি, নিজের থেকেই, আমার পা ছোটে ভিন্নমুখী। ওঁর অতিপ্রশান্ত হাসির জন্য আর অপেক্ষা করে না, অনেক সময় আমার এমন লোভ হয়েছে যে, দৌড়ে গিয়ে ওঁকে ভীষণ কোন খারাপ খবর দিই, ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিই হাসির ঐ কম্পহীন শিখা। অথবা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিই ওর বিনয়ের আলখেল্লা, উন্মোচিত করে দিই ভেতরের বস্তুটিকে। কিন্তু তার আগেই গেছি পালিয়ে।

একদিন বরং দেখা গেল, আমি নিজেই গেছি উন্মুক্ত হয়ে।

ঘটনাটা ঘটলো বাড়ীর মধ্যেই। ক'দিন ধরে পারিবারিক আবহাওয়ায় বড় গুমোট যাচ্ছিল, একটা নিম্নচাপ। এক অপরাহ্নে শুরু হল ঘূর্ণিঝড়। সহনশীলতা, অনুরাগ, ভব্যতা ইত্যাকার গাছপালা বাড়িঘর যা কিছু ছিল সমস্তকিছু গেল উড়ে, দেখা গেল আমার ভেতরের যাকে বলে পশু সেই বস্তুটা উন্মুক্ত প্রান্তরে একেবারে নগ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। বলাই বাহুল্য বিপক্ষে আমার গৃহিণী। আমার ধারণা ওঁর অবস্থা ছিল আরো বেশী উগ্র, অধিকতর উন্মুক্ত। আক্রোশে আমরা তর্জনগর্জন, হুঙ্কার-আস্ফালন করছিলাম। প্রতিপক্ষ আমার সমগ্র অপকীর্তির দীর্ঘায়িত তালিকা জ্বালাময় ভাষায় উপস্থিত করছিলেন। আমিও জবাব দিচ্ছিলাম দাঁতভাঙ্গা। সেই সন্ধ্যায় দীর্ঘদীনের দাম্পত্যজীবনে চূড়ান্ত কিছু যে ঘটবে সেটা নিশ্চিত ছিল। এক সময়ে গৃহিণীর কথা বলার

ব্যঙ্গানুকরণ করে অতিশয় সম্ভাবনাপূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে একটা বাক্যের অর্ধাংশ সমাপ্ত করেছি কি করিনি—এই সময়ে গৃহের বালকভৃত্য পড়ল লাফিয়ে—"একজন সাহেব আইছে।"

ঐ অবস্থাতেই বাইরে এসে দেখি আর কেউ নয়, আমাদের সেই সুবিনয়ী আলী হোসেন সাহেব। তৈলসিক্ত সংক্ষিপ্ত কেশরাজি বিক্ষিপ্ত শোভায় সুবিন্যস্ত। ঢাকা দেয়ার চেষ্টায় মাথার টাক আরো বাঙ্‌'ময় হয়ে উঠেছে। মাখনের মত নরম এক টুকরা হাসি ছড়িয়ে বললেন—"দাম্পত্য আলাপে বিঘ্ন ঘটালাম বুঝি।"

আমার ভয় ছিল অসমাপ্ত বাক্যটা ঐখানেই সমাপ্ত করব। আশঙ্কা ছিল অর্ধাঙ্গিনী ও আলী হোসেন সাহেবের উপর সম্মিলিত ক্রোধ লম্ফ দিয়ে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড ঘটাবে। এসপার-ওসপার কিছু একটা হয়েই যাবে আজ। মুখও খুলেছিলাম। হঠাৎ শুনি আমার মেজাজ সম্পর্কে গৃহিণীর হৃদয়হীন মন্তব্যটা কানে বাজছে। তাঁর মূর্তি দেখি নিষেধের লাল আলো হয়ে জ্বলে উঠেছে। ঐ খোলামুখে আমি চাকরকে ধমকালাম, নাস্তাপানি দেওয়ার জন্য। ভদ্রলোকের বিনয় অবর্ণনীয়। না, না, মোটেই ব্যস্ত হবেন না।

তিনি অব্যস্ততার সঙ্গে নাস্তা খাচ্ছেন, আর আমি স্বীয় পাকস্থলীর উপর দোষ চাপিয়ে বসে বসে দাঁত কিড়মিড় করছি। এই রকমের একটা অবস্থায় হঠাৎ খেয়াল হল টাকা ধার দিতে আসেননি তো আলী হোসেন সাহেব!

এর একটা ইতিহাস আছে।

লোকের কাছে আমি টাকা ধার চেয়ে থাকি। হরিণের যেমন দ্রুত ছোটা, জিরাফের যেমন লম্বা গলা, আমারও তেমনি ধার চাওয়া—বাঁচার তাগিদে যাঁদের পছন্দ নয়, পরিহার করতে চাই যাঁদের, তাঁদের কাছে হাত পাতি, আর দেখি ফল ফলে হাতে হাতে—তাঁরা পালাই পালাই করে বেড়ান। আলী হোসেন সাহেব যদি জিজ্ঞেস করতেন তাহ হলে ঐ বাত্যাবিধ্বস্ত অবস্থাতেও স্বীকার করতাম যে, বুদ্ধিটা গৃহিণীর কাছ থেকে নেয়া।

কিন্তু তিনি কোন প্রশ্নই জিজ্ঞেস করছেন না, খাচ্ছেন, হাসছেন তার চেয়ে বেশী। আমি তাঁকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম নিজের দুর্দশার কথা নিবেদন করে। কিন্তু তাঁর মিতব্যয়ী বাক্যাবলী ওই পথে মুখ তুলেও তাকাচ্ছে না। চিঠি দিয়েছিলাম উপন্যাসের ভাষায়, হৃদয় দিয়ে পড়লে চোখ মুছতে মুছতে আসার কথা টাকা হাতে নিয়ে। কিন্তু কৈ, অনিচ্ছুক প্রসঙ্গদের নিয়ে টানাটানি করে তিনি ও আমি পরিশ্রান্ত হচ্ছি যদিও তবু তিনি ঐদিকটা একেবারেই মাড়াচ্ছেন না।

"আমার চিঠি পেয়েছেন?"—মরিয়া হয়ে অনিশ্চিত তীর নিক্ষেপ করি ভয়ে ভয়েই। পাছে তিনি আমাকে ঘুঘু ঠাওরান, ঠাওরে টাকা দেয়ার সিদ্ধান্ত পাল্টে নেন।

"চিঠি? কোন্ চিঠি? কই নাতো?"—একেই বোধ হয় বলে আকাশ-থেকে পড়া।

যদি তখন লাফিয়ে উঠতাম, ছুটে গিয়ে ওঁর সই সহ এ্যাকনলেজমেণ্ট রিসিটটা এনে নাকের ডগায় তুলে ধরতাম তা'হলে সেটা অসঙ্গত কিছু হত না। কাঁচা কাজ করে না এই শ্রীমান, চিঠি রেজিষ্ট্রী করে পাঠিয়েছিল।

"কি ছিল চিঠিতে?"—আলী হোসেন সাহেবের গলায় বিনয় ও কৌতূহলের প্রতিযোগিতা। "নাঃ না, কিছু না"—আশ্বস্ত করতে হয় ওঁকে।

তখন দেখি নরম হাতে অন্য একটা প্রসঙ্গ আলগোছে তুলছেন তিনি—"আমার সেই শ্যালিকার কথা মনে আছে আপনার?" আছে বৈকি। আলী হোসেন সাহেবের শ্যালিকার কথা দিব্যি মনে আছে, আমার খালাত ভাইয়ের সঙ্গে ওর বিয়ের কথা তিনি এনেছিলেন কিছু দিন আগে। বুঝলাম—ঐ লাইনেই অগ্রসর হবেন, আর সেই লজ্জার কারণ হবে আমার পক্ষে। আমার ভাইটি ইতিমধ্যেই পাত্রীস্থ হয়েছে। আলী হোসেন সাহেবের শ্যালিকার অস্তিত্ব সে জানতেই পারেনি—আমি জানাইনি।

"ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে।" আমাকে আশ্বস্ত করলেন আলী হোসেন সাহেব। "আর সেই ব্যাপারেই এসেছি।" বলে কী! "কিছু টাকা দরকার—"

দিলাম।

আমি দু'শ টাকা ধার দিলাম আলী হোসেন সাহেবকে। আমি জানতাম ভীষণ কিছু ঘটবে এই সন্ধ্যায়। চূড়ান্ত কিছু করব আমি। যে মানসিকতার চাপে ঘটল ঐ অসম্ভব ঘটনা সেই মানসিকতা নিশ্চয়ই আরো অনেকের হয়, নইলে অত লোক আত্মহত্যা করবে কেন এই সংসারে! গৃহিণী আমার স্বভাবের বংশপারম্পরিক কৃপণতার উপর নির্মম আক্রমণ করেছিলেন, তাঁর সামনে সশব্দে টাকা বার করলাম আমি, দেখুন, তিনি দেখুন আমার ঔদার্য, উপযুক্ত পাত্র পেলে টাকা ঢালতে অপরাঙ্মুখ নয় এই বান্দা।

এর পরে আলী হোসেন সাহেবকে দেখে আর পালানোর দরকার হয়নি আমার। তিনিই পালিয়েছেন, আমাকে দেখে।

একবার দেখি ট্রেনের কামরায় উঠেছেন কষ্টেসৃষ্টে, ভেতরে আমাকে দেখে ত্বরিৎ নেমে গেলেন, এক মুহূর্তে। সেটা মনের ভুল হতে পারে, কিন্তু রাস্তায় হাটেবাজারে তাঁকে যে সটকে পড়তে দেখেছি সে-কথা হলপ করে বলতে পারব যে-কোন আদালতে।

আর যখন উধাও হলেন তখনি নিশ্চিন্ত হওয়া গেল এই ব্যাপারে যে আসল ঘুঘু কে। দু'শো টাকার বৃহৎ পত্রবহুল বৃক্ষে এই ঘুঘুর ডাক আমি নিরন্তর শুনতে পাই। নিজেকে মনে হয় যেন উদাস কোন পথিক ক্লান্ত এক দুপুরে।

উমেদ আলী

সিনেমা হলে একবার ঢুকে পড়তে পারলে আরাম আছে। আয়াসের সঙ্গে বসুন, লোকজন দেখুন, কিছু খেতেও পারেন অন্যমনস্ক ভাবে। তারপর চলল চলচ্চিত্র। অনেকদিন পর সেদিন যে-ছবিটি দেখলাম তাতে প্রায় সব কিছুই আছে ঃ আমোদ-প্রমোদ, হাস্যকৌতুক, সমাজচিন্তা। মুখোশ পরে ঘুরছে একজন, ট্রেনও ছুটে গেল বার কয়েক। বেশ জমে উঠেছিল ছবি দেখা। এই সময়ে হঠাৎ এক ভদ্রলোক—ঐ চলচ্চিত্রেই। নির্যাতিত স্বামী। দাম্পত্য তর্জন-গর্জন সিদ্ধান্ত-সঙ্কল্প সব কিছু স্ত্রীই করছেন—স্বামী আছেন না-থাকার মত। তাঁর ঠোঁট থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে ওঠে, কিন্তু কথা ফোটে ফোটে ফোটে না। ফোটার আগেই স্ত্রী ধমকে ওঠেন, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কি।" আর তখন আমরা বিশেষভাবে জানতে পারি যে, তিনি—স্বামী ভদ্রলোক—দাঁড়িয়েছিলেন অতক্ষণ। ধমকাধমকির সময়ে দর্শক মহলে মৃদু গুঞ্জন ওঠে। একবার কে যেন চীৎকার করেও উঠেছিল।

ঐ যে এলেন ভদ্রলোক, আসা মাত্রই আমাকে বিব্রত করলেন। পরিচিত চরিত্র ; কিন্তু কি যেন কী-একটা আছে তাঁর চেহারায়। কেমন একটা অপরাধী অপরাধী ভাব—অসাবধানতায় কাঁচের বাসন-পেয়ালা ভেঙ্গে ফেললে, ভালো মাছের দরে পচা মাছ কিনে আনলে, অনেক দেরিতে বাসায় ফিরলে গৃহস্বামীদের যেমন অবস্থা হয়ে থাকে সেইরকম। কিন্তু কি তাঁর অপরাধ? অন্য মহিলাতে আসক্ত হয়ে স্ত্রীর কাছে হাতেনাতে ধরা পড়েছেন? ঘরজামাই থাকেন?—দেখি মনের ভেতরে সৌখিন গোয়েন্দা কেবলি টিক-টিক করছে।

আর সেই সঙ্গে অন্য একজনের চেহারা মনে পড়ল আমার। ঠিক এই চেহারা। উমেদ আলী। শ্রাবণের থমথমে আকাশ যেন, যে-কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে, ঐ পড়ল বুঝি, তবু পড়ছে না।।

কিন্তু আমি তো উমেদ আলীর বিষয়ে চিন্তা করার জন্য এত কাঠখড়-রিক্সা পুড়িয়ে চলচ্চিত্র দেখতে আসিনি। উমেদ আলীর মুখটাকে দাবিয়ে দিলাম জোর করে। কিন্তু আবার দেখি ভেসে উঠেছে। এবার ঐ চলচ্চিত্রের স্বামীবিষয়ক জিজ্ঞাসা দিয়ে ঘা দেওয়া গেল উমেদ আলীর ভাসমান মুখে। তাইতো এই ভদ্রলোক কিছু একটা করবেন বলেই মনে হচ্ছে। ঐ যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট নাড়ানো ওর তলে তলে কোন ফন্দি ঠিক করেছেন নিশ্চয়ই। কিছু একটা ঘটাবেন তিনি। ঘটাবেনই। কিন্তু কই?—ছবি তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে, অথচ তাঁর কাজের কোন হদিশ নেই।

ওদিকে উমেদ আলী বসে নেই। আবার উঠেছে ভুস করে ভেসে। উমেদ আলীর বাবামাতে ভীষণ ঝগড়া ছিল। কিন্তু মিল ছিল এক ব্যাপারে। বাবার হুকুম ছিল সন্ধ্যে হইলেই পড়তে বসবি, আর মার ছিল সন্ধ্যে হলে দুধ খেতে যেন ভুল না হয়। ফলে সে বাতি জ্বালার আগেই দুধ খেয়ে বই খুলে পড়তে বসত। আর গজর গজর করত। আজও তাই করছে। তার চেহারার শ্রাবণ-শ্রাবণ ভাবটা আমি প্রথমে টের পাইনি। একদিন বাসায় এসে কুণ্ঠার সঙ্গে বলল – কথা আছে। আমি প্রমাদ গুণলাম, নিশ্চয়ই উপকার চাইবে, কিন্তু বলল উল্টো কথা —কথা বলতে গেলে সে তোতলায়। আমি তো হেসেই খুন। ঝরঝর করে কথা বলে, কোনদিন তো তো করতে দেখলাম না। বলল—মুখের তোতলানো নয়, মনের। কথারা আসে, জমে, ভিড় করে, কিন্তু বার করতে গেলে গা মোড়ামুড়ি, এ ওর পেছনে লুকানো সুরু করে দেয়।

এই প্রথম ওর শ্রাবণ-শ্রাবণ মুখটা খেয়াল করলাম আমি। সত্যি করুণ। সেই প্রসিদ্ধ ঘটনাও মনে পড়ল যাতে সে তার বিশেষ মনোনীতা মেয়েটির কাছে দীর্ঘদিনের শ্রমে-প্রস্তুত কথামালা নির্বেদন করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছিল, "হৃদয়ে চিরিয়া" দিয়ে সুরু করবে নাকি "জনম জনম হাম" দিয়ে—এই গুরুতর ব্যাপারে হঠাৎ করে কোন

সিদ্ধান্ত না-নিতে পেরে তোতলিয়েছিল। যার জন্যে সে-কালের মেয়েদের মধ্যে আজও সে তোতলা বলেই খ্যাত। এখন যে মহিলার কর্তৃত্বে আছে উমেদ—তিনি কথা বলেন একতরফা, উমেদ শুধু শোনে। শুধুই শোনে। ও যখন অসহায় মুখ করে বলল, "কি করি এই তোতলানি নিয়ে, বলত ভাই।" তখন আমি এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেছিলাম। কথা বলতে হবে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে, আত্মসচেতনাকে পরিহার করা চাই। শ্রোতাদের মনে করতে হবে যেন তারা কিছুই নয়, কুকুর-বেড়াল মাত্র। উমেদ মন দিয়ে শুনল। তারপর উঠে গেল এক সময়ে। ম্রিয়মাণ গলায় বলে গেল—"তা-ই করব।" যখন দরজার বাইরে চলে গেছে তখন আচমকা আমার খেয়াল হল, আরে তাইতো ওতো এসেছিল শোনাতে। শেষে শুনেই গেল। বেচারা।

কিন্তু চলচ্চিত্রের এই ভদ্রলোক কিছু করছেন না কেন? অশ্বস্তিতে পড়লাম খুব। ওদিকে ছবি যে প্রায় শেষ হয়ে এল! গলায় তাঁর ঝুলছে যে টাই ওর সাহায্যে বড় কোন কাণ্ড করে বসবেন নাতো অন্তিমদৃশ্যে!

উমেদ আলী আবার মাথা তুলেছে। "শ্রোতা পাইনা", আরেক দিন বলেছিল আমাকে। পথে দেখা, স্থির করলাম আজ শুধু শুনবই; তখন বলল ঐ কথা, "শ্রোতা পাই না।" ফাঁকা মাঠ, নদীর তীর, নির্জন পাহাড় ইত্যাদির কথা মনে এসেছিল, কিন্তু বলতে গিয়ে দেখি আমিও তোতলাচ্ছি। কোথায় পাবে ওসব শ্রোতা বেচারা উমেদ আলী! তবে জানলাম যে, সে গোসলখানায় দরজা দিয়ে কথা বলে। বেশীক্ষণ থাকতে পারে না, বাইরে অন্যেরা অপেক্ষা করছে, পাছে তারা শুনে ফেলে—শ্রোতার অভাবে মনমরা যে তার আবার শ্রোতাকেই ভয়। আপিসে বা গৃহে যেখানই হোক, ধমক খেলে উমেদ আলী সরাসরি গোসলখানায় চলে যায়, কল ও গলা একসঙ্গে খুলে দিয়ে শেষে হুস্কা হয়ে ফিরে আসে—যদি খালি পায় গোসলখানা।

না, এই ভদ্রলোক বোধ হয় হতাশই করলেন সকলকে। এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল, না, খাঁটি মনুষ তিনি, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন, বিকট স্বরে ধমকে দিয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে। সমস্ত হল জুড়ে সেকি করতালি।

না, প্লেটবাসন ছুঁড়ে মারেননি। "অনেক সহ্য করেছি আর নয় বলে নিক্ষিপ্ত করেননি বদ্ধ মুঠিকে। স্থির গলায় বলেছেন, "খবরদার, নিরীহ ছেলেটির প্রতি অনেক অন্যায় করেছো, আর নয়!" ছেলেটি তাঁর নয়, অন্যের, তাঁদের শুধু একটিই সন্তান। মেয়ে। ছেলেটি যাকে বিয়ে করতে চায়। মেয়ের মা'র সিদ্ধান্ত বিপরীত, তাই নানান রকম মিথ্যে রটনায় বিষিয়ে তুলছিলেন মেয়ের মন। মেয়ের বাপ যে লক্ষ্য করেছেন নীরবে, মা সেটা খেয়াল করেননি, আমরাও না। এবার চরম মহূর্তে প্রতিবাদ করলেন স্ত্রী কর্মের বিরুদ্ধে। বিয়ে হল পাত্র-পাত্রীর।

দেখি আমিও হাততালি দিতে উদ্যত হয়েছি, আত্মসংরণ করতে গিয়ে খেয়াল হল উমেদ আলীকে এই একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পরামর্শটি দেয়া হয়নি। পরোপকার কারো, পরোপকার করো, জোর আসবে গলার, সাহস আসবে বুকে। আটকাবেনা কোন কথা।

দেখেছি পরোপকারের ইচ্ছে থাকলে কথা আটকায় না কারো কখনো। একবার এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল যে, আমার কিছু মাইনে বাড়বে, তখন দেখি দলে দলে উপকারীরা আসছেন আমাকে নানাবিধ পরামর্শ দিতে। অনায়াসে বলছেন কথা।

মনে পড়ে প্রবল এক বাদল বরিষণে আসর জমিয়ে বসেছি ঘরে। আপিসে যাবো না, খিচুড়ি খাবো, শুয়ে শুয়ে গোয়েন্দা কাহিনী পড়ব এমন সঙ্কল্প। সেই সুখময় মুহূর্তে আচমকা হানা দিলেন এক ভদ্রলোক। ক্ষীণ স্বাস্থ্য, নিরীহ গলা, জীবনভর অন্যের উপকার করে আসছেন। এবারও করলেন। ঐ বিয়ের ব্যাপারই। এক্ষেত্রে পাত্রীর পিতা ভয়ানক অনিচ্ছুক। পাত্রের আত্মীয় ধরেছেন এই ক্ষীণস্বাস্থ্য ভদ্রলোককে, তিনি ধরেছেন আমাকে, আমি ধরব পাত্রীর পিতাকে। শেয়ালদের সেই কাঁঠাল খাওয়া। ওঁর গলার জোরের দরুনই পরের দৃশ্যে দেখা গেল দুহাতে রিক্সার কাপড় উঁচিয়ে আমরা চলেছি। তিনি আগে নেমে গেলেন, একটি দোকানের চালের নীচে দাঁড়িয়ে রইলেন ছাতি ফুটিয়ে। আমি অনেকক্ষণ পরে পাত্রীর পিতার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে এসে দেখি তিনি ভিজে ভিজে কাক। "কোন ফল হল?" প্রশ্নের সঙ্গে তাঁর তেমন একটা ভঙ্গি যা শুধু পরোপকারীর পক্ষেই সম্ভবপর। যখন

ফিরছি রিক্সায় কাপড়-জামার চেয়েও বেশী ছলছল করে উঠেছিল আমার চোখ। সত্যি পরের জন্য আত্মত্যাগ এখনো দুনিয়ায় আছে!

আমার চেষ্টায় কিনা বলতে পারিনা, ঐ বিয়েটা হয়েছিল।

এই সেদিন তিনি আবার এসেছিলেন। এবারও বৃষ্টির মধ্যে। তবে এখন অসুবিধে নেই, গাড়ী কিনেছেন নিজে। একজনের মেয়েকে কলেজে ভর্তি করা আবশ্যক। সেইজন্য তিনি আমাকে ধরেছেন যাতে আমি আরেক জনকে ধরি যিনি কলেজের এক অধ্যক্ষাকে ধরলেও ধরতে পারেন। আবার সেই কাঁঠাল খাওয়া।

ভাবছি উমেদ আলীকে আবার সত্যি সত্যি একটা বক্তৃতা দেব আমি। ভাই উমেদ আলী, তুমি কাঁঠাল খাও, পরোপকার ধরো। সবাই ধরেছে, শুধু তুমি আর আমি পিছিয়ে থাকি কেন?

ছাপাখানা

ছাপাখানার সঙ্গে আমার প্রথম ঘনিষ্ঠতা বিয়ে উপলক্ষে। বিয়ে করেছিলেন আমার ছোট মামা। সেই বিয়ের 'উপহার' ছাপার মওকায় সেই আমার প্রথম গা-মাখামাখি ছাপাখানার সঙ্গে। কার্ড ছাপায় আমার হাত ছিল না, অথবা বলতে পারি হাত বাড়ালেও নাগাল পাবায় উপায় ছিল না, মুরব্বিরা সেটিকে অনেক উঁচু তাকে তুলে রেখেছিলেন। কিন্তু ভাইবোনেরা মিলে যে-উপহারটি আমরা দিয়েছিলাম সেখানে আমিই সর্দার। অতএব পুরান উপহার কেটে জোড়াতালি দিয়ে নতুন উপহার সাজানো থেকে সুরু করে ছাপার পরে লাল কালিতে সযত্নে বর্ণাশুদ্ধি করা পর্যন্ত কোন কাজেই আমার নেতৃত্ব প্রবলভাবে বিপদগ্রস্ত হয়নি। —সেই বিয়েতে অত যে হৈ চৈ গেল তার ভেতর আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান মনে হল ছাপাখানার সঙ্গে ঐ বন্ধুত্ব।

তার আগে ছাপাখানা যে দেখিনি তা নয়। এমন কি একবার ভেতরেও গিয়েছিলাম, যে-আত্মীয়টি আমাদের বাসায় থেকে তাঁর আসন্ন পরীক্ষার জন্য দ্বিতীয়বার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তাঁকে অনেক কষ্টে রাজী করিয়ে। যে যন্ত্রে রাজ্যের বই, বিশেষ করে আমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্র তৈরী হয় শুনেছি তার অন্দরমহল সম্পর্কে এমন-একটা ঔৎসুক্য ছিল যে, ঐ আত্মীয়টির সময়-নষ্টজনিত সমূহ ক্ষতির ভয়াবহ সম্ভাবনাকেও তোষামোদের জালে আটক করার মত কঠিন কাজে সফল হয়েছিলাম। এবং অন্দরমহল দেখে চোখ বড় বড় হয়েছিল; মনে হয়েছিল, কিসের ট্রেনের ড্রাইভার, বড় হলে আমি ছাপাখানার মেশিনম্যানই হব, পায়ে পায়ে টিপে টিপে একটির পর একটি কাগজ অমন অবলীলায় ছাপিয়ে আনব। তাতে রাজ্যের গল্প-কবিতা থাকবে, খবরাখবর থাকবে, এমনকি

পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও। মেশিনে তখন স্থানীয় সিনেমা হলের পরবর্তী আকর্ষণের বিজ্ঞাপন ছাপা হচ্ছিল।

আত্মীয়টি এই নবীন জ্ঞানার্থীর অপলক কৌতূহলের কি অর্থ করেছিলেন জানিনা, তবে ফেরার জন্য যে ব্যস্ততাটি দেখিয়েছিলেন তা যে আমার ভাল লাগেনি সেটা স্পষ্ট মনে আছে।—তারপর প্রতীক্ষা, কবে সেদিন আসবে যেদিন ইংরেজী বাজনা বাজিয়ে, ফেষ্টুনে বড় বড় ছবি ঝুলিয়ে এরা, সিনেমার লোকেরা, ঐ আমার ছাপ্‌তে-দেখা বিজ্ঞাপনটি হাতে হাতে বিলি করবে। সেদিন একদিন সত্যি সত্যিই এসেছিল। স্কুল থেকে ফেরার পথে পাশের বাসার সমপাঠীটিকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুল হয়নি যে, তার হস্তস্থিত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রণকার্যের আমি প্রত্যক্ষ দর্শক। বলতে গিয়ে গলায় গর্বের যে একটা আমেজ এসেছিল তা বুঝি ধমক খেয়েছিল সহযাত্রীর কাছে। ছাপাখানা জিনিসটা যে তেমন তাজ্জব কিছু নয় এবং তার কাকারই য একটা ছাপাখানা আছে খুলনায় এমন নির্বিকার ভাষণে। কিন্তু তাতে উৎসাহ দমেনি, সেদিনও নয়, তারপরেও নয়। বলাবাহুল্য তা এ কারণে নয় যে, বন্ধুটি ওপাড়ার গোপালের মত সুবোধ বালকটি ছিল না এবং সত্যভাষণে তার অনুৎসাহ কারো অজানা ছিল না, বরং একারণে যে, ছাপাখানা এখনো আমার কাছে সমান রহস্যময়।

এমনিতে আমি যন্ত্রের ভক্ত নই। কিন্তু ছাপাখানাকে আমার কখনো যান্ত্রিক মনে হয়নি, তার সঙ্গে মানুষের চিন্তা ও দুশ্চিন্তার, স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের যে-অন্তরঙ্গতা তা তাকে একটা মানবিক ঐশ্বর্য দিয়েছে বলে ধারণা হয়েছে। একথা অবশ্যি ঠিক যে, আমার মেসিনম্যান হওয়া হয়নি, কম্পোজিটরও নয়, এমনকি ছাপাখানার কাছাকাছি কেউও নয়; এবং ছাপাখানার সঙ্গে জানাশোনার বয়সও গভীরতা দুই-ই বেড়েছে। আর ছাপাখানা যে যন্ত্রও, সে-জ্ঞানলাভকে আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারিনি। যে-ছাপাখানায় আমার যাতায়াতের সুযোগ ছিল তার পুষ্টদেহ মেসিনম্যান 'চায়ের উপরই দিন কাটাতে রি' বলে গর্ব করত; একদিন গিয়ে দেখি তার জায়গায় অন্য লোক; জিজ্ঞেস করায় পরিচিত কম্পোজিটর তির্যক্ হেসে ফ্ল্যাট মেসিনটাকে দখিয়ে

বলেছিল, 'ওকে জিজ্ঞেস করুন।' টাইপের সীসাতেও যে বিষ আছে এ খবর তার আগেই পেয়েছিলাম।

কিন্তু কই, তবু মোহ কমল কই। তার অলিগলির সব খবরই রাখি, কলাকৌশল সবটাই জানা, তবু সে এখনো আমার কাছে ঐ প্রথম দেখার মত না হোক দ্বিতীয় দেখার কাছাকাছিই। বয়োবৃদ্ধির ইতিহাস যদি হয় মোহমুক্তির ইতিহাস তাহলে এক হিসাবে আমার বয়স বাড়েইনি। এখনো প্রুফ-গ্যালি, লেড-রুল, কালি-ঝুলি, ছোটাছুটি নিয়ে ছাপাখানা অন্য-একটা রাজ্যের, রাজ্য না-হোক দ্বীপের মত আর কাছে। হাতে-কাপড়ে কালিমাখা মেসিনম্যান ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে বলছে, 'স্যার, অত কাটবেন না, ইমপোজ করা হয়ে গেছে, তাহলে আবার খুলতে হবে।' পাশেই আমার লেখার দ্বিতীয়াংশের তৃতীয় প্রুফটা এল, ভেজা ভেজা কাগজ, নিষ্কলঙ্ক, কিন্তু অনেক চিহ্নের আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার আশঙ্কায় যেন একটু কম্পমান। তারপর যখন ছাপান ফর্মাটা হাতে এল, তার চেহারা, তার গন্ধ—কম জিনিস জানা আছে যার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। আর ঐ নিজের লেখা মুদ্রিত দেখার ভেতর ব্যক্তিত্ব-উপলব্ধির লোকচক্ষু-অগ্রাহ্য যে-একটা প্রচণ্ড শিহরণ আছে তা কোনদিনই ঘুচবে মনে হয় না।

অন্ততঃ এ পর্যন্ত যে ঘোচেনি তা ঠিক। সেই প্রথম যেদিন ছাপার অক্ষরে নাম বের হয় দৈনিকের ছোটদের পাতায় সেদিন যে কাঁপন লেগেছিল নিতান্ত অবজ্ঞাত এক বালকের মনে তার সঙ্গে আমার সাম্প্রতিকতম অভিজ্ঞতার তফাৎ যদি থেকে থাকতো তা পরিমাণগত—প্রকৃতিগত নয়। যে 'আমি'টি ঘরে বাইরে নিতান্ত সন্ত্রস্ত, অভিভাবকদের নিয়মিত শাসনের তর্জনে-গর্জনে ক্ষীণপ্রাণ, তারও যে একটা দাম আছে, ব্যক্তিত্ব আছে. হাজার হাজার লোকে সে-খবর জানে—এই বোধ সেদিন এসেছিল। মনে হয়েছিল আমি বুঝি রবীন্দ্রনাথ! কে না জানে এ বোধ সকলেরই একদিন থাকে, তারপর বয়স যতই বাড়ে, সংসারের রোদ যতই চড়া হয় খোলা-চোখে মোহ ততই কমে আসে। কিন্তু বলতে সঙ্কোচ নেই, আমার কমেনি। হয়ত তার কারণ এই ব্যক্তিত্বের উপলব্ধির আর-কোন পথ আমার ভাল জানা নেই, আর জানা যদিও বা আছে তবু আয়ত্তে নেই।

আমি ভাবতে ভালবাসি যে, ছাপাখানার আবিষ্কার মানুষকে যা শিখিয়েছে তা ব্যক্তিত্বের সচেনতা অর্জন করবার পথ। এমনিতে মানুষ কত ছোট, বিশ্বসংসারে তার স্থান আমাদের পরিবারে বাল্যকালের 'আমি'র চেয়ে কি আর বেশী বড়! তবু সে যে হীন নয়, সে একক অনন্য এ বোধ লাভে ছাপাখানার দানটা কম নয়। কালের সমুদ্র অন্ধকারে ভরা, তবু মানুষ তাকে আর ডরায় না, ছাপাখানার ভেতর দিয়ে তার গলা পাঠায় সমুদ্রের সমস্ত তর্জন-গর্জনকে উপেক্ষা করে। এবং ছাপাখানা আছে বলেই সে গলা উঁচিয়ে বলতে পারে, দম্ভের সঙ্গে, আমি আছি, 'আমার মৃত্যু নেই, আমি কালজয়ী।'

আরো একটি কারণ আছে আমার মোহের। ছাপাখানাকে যতই জানি সে যে পুরাতন হয় না। তার কারণ সে স্টেশনের মত—নিজে চলে না, কিন্তু অন্যকে চালায়। দাঁড়িয়ে আছে, নিশ্চল—সন্দেহ নেই কিন্তু প্রতিমুহূর্তে নতুন নতুন সচল কথারা আসছে কলকোলাহল করে। স্টেশনকে কি তুমি ভাবতে পার যাত্রীদের বাদ দিয়ে? যাত্রীদের জন্যইত সে আছে, তাদেরকে নিয়েই তার চিত্র। ছাপাখানাও তেমনি, সে পাল্টাচ্ছে, বদলাচ্ছে, নতুন চেহারা নিচ্ছে। কেননা প্রতিমুহূর্তে সে নতুন নতুন কথার জন্য জায়গা করে দেয়, যে-কথারা ভিন্ন ভিন্ন স্টেশন থেকে এসেছে—কেউ কাছের, কেউ বা অনেক দূরের, হয়ত অন্য জেলার। আর তাদের চেহারাই বা কত রকমের—কোন দু'টি মানুষ যেমন এক নয়, তেমনি এক নয় কোন দু'টি কথাও।

তাই অতিপরিচিত ছাপাখানায় গেলেও আমার মনে হয় নতুন জায়গায় এলাম। সেই প্রথম যেদিন আত্মীয়টির সঙ্গে তাকে দেখতে যাই সেদিন যেমন মনে হয়েছিল, সেই উপহার ছাপার দিন যেমন অনুভব করেছিলাম আজও তেমনি। তার ব্যস্ততা, যন্ত্রের শব্দ, স্থানাল্পতা সব কিছু সত্ত্বেও মনে হয় একটা মুক্ত খোলা-মেলা জায়গায় এসেছি। সেখানে নতুন নতুন কথারা মেকআপ নিচ্ছে, মঞ্চে নামার আগে। ছাপাখানা ঐ গ্রীনরুম। মঞ্চের চাইতে মঞ্চের পেছনটাই বেশী আকর্ষণীয় আমার আছে, বেশী উত্তেজনাপূর্ণ।

নতুন শহরে এসে অনেকেই অনেক কিছুর খবর করেন থাকবার ভাল জায়গা, যাবার মত সিনেমাহল বা কেনবার মত জিনিসের বাজার। আমি খোঁজ নেই ছাপাখানার। ক'টা ছাপাখানা আছে, কি কি জিনিস ছাপা হয় সেখানে, বিড়ির পাতা ও মাসিক পত্রিকার ছাপার অনুপাত ইত্যাকার সংবাদ সংগ্রহের সময় একটি কথা বার বার মনে পড়ে আমার। কথাটি একজন চক্ষুচিকিৎসকের, টর্চের আলো ও এক প্রকার কাঁচের সাহায্যে আমার চক্ষুর স্বাস্থ্যনির্ণয় করবার সময় মূল্যবান কথাটি বলেছিলেন তিনি, 'স্বাস্থ্যের আসল খবর পাবেন কোথায় জানেন? মোটা শরীরে নয়—চোখে, মানুষের চোখে।' আর আমার ধারণা ছাপাখানা শহরের চক্ষু, এমনিতে দেখতে শহরটি যতই কেউকেটা মনে হোক না কেন, তার আসল স্বাস্থ্য আমি দেখি সে-শহরের ছাপা-খানায়। যে-শহরের ছাপাখানা যত বেশী বিড়ির লেবেলের হুকুমবরদার সে-শহর আমার কাছে ততটাই কম আকর্ষণীয়। আমি জানি সেখানে আমি দু'-দিনেই খুব হাঁপিয়ে উঠব। ঐ শহর সম্পর্কে যা সত্যি, দেশ সম্পর্কেও তাই। ছাপাখানা মূল্যবোধের মাপকাঠি, সে কতটা বিলাসী তাই দেখে জানাযায় দেশের লোকদের কতটুকু শিক্ষাদীক্ষা। ইংরেজরা যে ছাপাখানা বলতে খবরের কাগজও বোঝায় এবং আমরা যে শাড়ীও ছাপিয়ে থাকি সে ব্যবধান নিশ্চয়ই নিতান্ত তাৎপর্যহীন নয়।

ছেলেবেলার সেই ছাপাখানাগুলো এখন কোথায় কে জানে। এখানকার সব ছাপাখানা বা বড় জংশন স্টেশন, তকতকে, ঝকঝকে, এবং চটপটে; আর সে কারণেই যেন বড় বেশী নৈর্ব্যক্তিক। কোথায় কম্পোজ হচ্ছে আপনার লেখা, ছাপাই বা হচ্ছে কোথায় তা জানবার উপায় নেই। সেই পুরান দিনের প্রেস সম্পর্কে ভেতরে ভেতরে একটা দুর্বলতা আছে আমার, বলতে পারি নষ্টালজিয়া। সেখানে আমাদের হাতের লেখা চিনত কম্পোজিটরেরা, যেমন আমরা চিনতাম তাদেরকে। কম্পোজি-টরের কাছ থেকে কপি তুলে সংশোধন করে দিতাম, কোন জায়গায় কত এম্ দিতে হবে বুঝিয়ে দিতে পারতাম। এমন কি মেশিনম্যানকে চা খাবার পয়সা ঘুষ দেবার রীতিও সেখানে চালু ছিল। এখন কেতা বদলেছে, এখন তারা অনেক দূরের।

ছাপাখানা সম্পর্কে একটা উপমা আমার মন থেকে কখনো মুছবে না। সেই আত্মীয়টির কাছে এ বিষয়ে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। তিনি যে-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন সে-পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ঐ প্রথম-দেখা প্রেসটিতে ছাপা হয় কিনা জানতে চাইলে তিনি কণ্ঠে উষ্মা ঢেলে জানিয়েছিলেন—সে-প্রশ্নপত্র ছাপা হয় সমুদ্রে, জাহাজ ভাসিয়ে, ছাপা হয়ে যাওয়ার পর জাহাজ তবে ভেড়ে কূলে।

এর সত্যাসত্য যাই হোক, চিত্রটি মোছেনি। —ছাপাখানার লোকেরা আলাদা, ভিন্ন গোত্রের, পারের মানুষের তারা, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অথচ পারের মানুষ তাদের সমীহ করে, তাদের ভয়ে ঐ আত্মীয়টির মত রাতের পর রাত ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করে। কিন্তু ছাপাখানা নির্বিকার, সে যেন আলাদা জগৎ।

ছাপাখানা যদি সত্যি সত্যি অমন হত, তাহলে তার রাজ্যের নাগরিক হবার দরখাস্ত করতাম আমি। রাজ্যেতো কত টাইপের লোকই আবশ্যক।

বীর

রসে আমার অসোয়াস্তি আছে। এই যখন গরম আসে জাঁকিয়ে তখন যে ওপরের আকাশে, নীচের রাস্তাঘাটে, গাছের ফলে, আর মানুষের গায়ে রসেরা ছপছপ করতে থাকে—মউমউ করে গন্ধ, কাপড়-জামা বরবাদ হয় পলে-অনুপলে, তাতে কেমন বিবমিষা জাগে আমার। পানের রঞ্জন-রস আবার ঐ বোঝার উপর শাকের অাঁটি।

সেদিন একা বসে রসের কথা ভাবছিলাম। হাস্যরসের কথাই মনে এল আমার সর্বপ্রথম। মনে-আসা আর অাঁতকে ওঠা। প্রাতভ্র্মণের পুরানো সুখ যে ছেড়েছি সে তো এক সুরসিকের ভয়ে। তিনি সকালে বের হন, আর লোক পেলেই রসিকতা করেন। কোলাকুলিও করতে চান হাসতে হাসতে। কাপড়-জামার আর হাল থাকে না।—পরে দেখি করুণ, অদ্ভুত, বীভৎস, বাৎসল্য—নানান রসের শোভাযাত্রা চলে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে। কিন্তু এদের কাউকে তো চাইনা, এদেরকে তো বরং এড়াতেই চাই।

তারপর ভেবেছি বীরদের কথা ভাবব। ভাবতেই বীরের খোঁজে আমার বিড়ম্বনার কথা মনে পড়ল। এক জনের কথা বলি।

এই বীর এক মনোরম সকালে চলেছিল রিক্সায়। পায়ের উপর পা দিয়েছে তুলে। সিগারেটে ধোঁয়া ছাড়ছে ফাল্গুন ও কমনার বাতাসে। রাজার মত তাকাচ্ছে চতুর্দিকে। হঠাৎ দেখে পাশের রিক্সায় চলেছেন ওরই চাচা শ্বশুর। সিগারেট লুকাল, পা নামাল, ঝুঁকে পড়ে সালাম করল। চাচা শ্বশুর হৈ হৈ করে উঠলেন। রিক্সা থামিয়ে প্রথমে নাম্যালেন তাঁর হাতের লাঠিটাকে, তারপর নামলেন নিজে। "চলাফেরা করতে কষ্ট হয় বাবা, আগের দিন কি আছে।" তিনি রিটায়ার করেছেন

কিছুদিন হল। নায়কের পাশে চাপলেন রিক্শায়, বললেন, চল তোমাদের বাসায়। অতএব সিগারেট গেল, ফাল্গুন গেল, কোথায় গেল গন্তব্য। বাসার কাছে এসে চাচা শ্বশুর ভাড়া দিতে উদ্যত হলেন, কিন্তু ব্যাগটা সহসা পেলেন না খুঁজে। পেলেন যখন তখন রিক্শাওয়ালার কাছে অত্যন্ত উঁচু গলায় ইনসাফ প্রার্থনা করলেন। ঐ হট্টগোলের মধ্যে নায়ক মিটিয়ে দিল পয়সা, বীরোচিত ভঙ্গী করে। তখন শোনা গেল ভদ্রলোক অন্যায়কে-প্রশ্রয়-দেয়ার অন্যায় বিষয়ে বলছেন।

আগন্তুকের নাস্তা জোগাড় করতে দু'জন চাকর ও একজন গৃহিণীর অনেক কষ্ট হল। ডিম পচা বেরুল। বিশেষ কোম্পানীর পাউরুটি আনতে হল। ভালো মাখন পাওয়া গেল মাইল দুয়েক দূরের দোকানে। "তোমাদের গাড়ি কেনার কি হল?" অমলেট শেষ করতে করতে জানতে চাইলেন। "এই কিনব আর কি।" "দেখতো বাবা, তোমাদের এত আছে, অথচ কত বিনয়। ওদিকে সামাদ মিয়াদের তো ফুটো পয়সার মুরোদ নেই, কিন্তু লাফ-ঝাপ অন্তহীন। তোমাদের টাকা শোধ দিয়েছে?" "দেবেন নিশ্চয়ই।" "দেবে! ফুটানি করার সময় পয়সার অভাব হয়না, অভাব হয় ধার শোধ দেবার সময়! আবার বাজারে কি সব বলে বেড়াচ্ছে শুনেছ?" "কি?" "শোনিনি?"—মিষ্টির প্লেটটা হাতে নিলেন চাচা শ্বশুর। "শুনলে সহ্য করা কঠিন।"

রসগোল্লাগুলো চিবুনোর ফাঁকে ফাঁকে যা জানালেন তার মর্মার্থ এই যে, সামাদ নামক আত্মীয়টি আমাদের নায়কের বাপদাদা তুলে অনেক কুৎসা রটিয়েছে। নায়কের একমাত্র কন্যা ঘরে ঢুকেছিল চকিতে। তাকে দেখে মুরব্বি বললেন, "আমাদের নাতনী না? আহা, কি ফুটফুটে চেহারা! আর সামাইদা বলে কিনা আকরামের যাও একটা মেয়ে হয়েছে এতদিনে সেও দেখতে হাতী। হবে না? অসৎ ব্যবসায়ের টাকা—।" চায়ের দ্বিতীয় কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন তিনি নিশ্চিন্তে। কিন্তু হুঙ্কার দিয়ে উঠল নায়ক, বীর আকরাম হোসেন। বলে কী? অনেকক্ষণ ধরেই ফুঁসছিল, এবারে অগ্নিউদ্গীরণ। চাচা শ্বশুরের লাঠিটা কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছিল। সামাদ নামক দুর্বৃত্তকে সে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তার স্ত্রী হাসল, বলল, "পাগল"। কিন্তু

চাচা শ্বশুর বিজ্ঞ লোক, বললেন, "তা রাগবেই তো মা। মান-সম্মান গেলে পুরুষ মানুষের আর রইল কি?"

আর রইল কি—এই প্রশ্নটা নিয়ে মেহমান চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ আন্দোলন করল আকরাম। হাঁটল, বসল, আবার উঠল। শেষে বেরিয়ে পড়ল ঝড়ের মতন। একটা হেস্তনেস্ত না করলেই নয়।

সামাদেরা থাকেন ফ্ল্যাট বাড়িতে। দরজার বাইরে থেকেই শোনা গেল ভেতরে কে কথা বলছে। আড়ি পাতল আমাদের নায়ক। চাচা শ্বশুরের গলা। না, কোন ভুল নেই। আম-কাঁঠালের গন্ধ পেলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাছিরা যে-রকম শব্দ করে অবিকল সেই ধ্বনি।

"আসব কি—" তিনি বলছেন।—"যা ডিসেন্ট্রি হয়ে ছিল। জমে-মানুষে টানাটানি। আর হবে না কেন বল? মাশাল্লাহ্ যা কিপ্‌টে আমাদের আকরাম মিয়ারা। সেবার কি সব কতগুলো খাওয়ালো কালো কালো, বাদাম তেলে ভাজা। খাওয়ার সময়েই মুখ থেকে পিছলে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিল। না খেলে আবার মন ছোট করবে। ঐ যে খাওয়া তারপরেই একেবারে বিছানা। তা খাওয়া না হয় এড়ানো গেল। না গেলেই হয়। কিন্তু মানুষের গিবত যে গায় সেটা এড়াবে কি করে বল? তোমাকে তো বলে রাস্তার ফকির। টাকা দিয়েছে শোধ দেয়ার নাম নেই। আবার বলে কিপ্‌টে। নাকি নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যায়। হেঁ হেঁ হেঁ।"

এখন নায়ক কি করবে বলুন?—এটা আমার জিজ্ঞাসা। সে কি লাফিয়ে পড়বে দরজার ওপর? কণ্ঠনালী চেপে ধরবে চাচা শ্বশুরের? কিন্তু সামাদ মিয়াও তো প্রস্তুত আছেন! আইন-আদালত হতে পারে। নাকি সে পালিয়ে আসবে গুটিগুটি, লেজ গুটিয়ে? ওদিকে স্ত্রী আছেন বসে, আসার সময়েই তিনি হেসেছিলেন—'দেখবো কত মুরোদ।' ফিরলে তো দুয়ো দেবেন দু'হাতের আঙ্গুল নেড়ে।

অথবা অন্য-এক বীরের কথা। আকরামকে তো তবু বাইরে বার করা গিয়েছিল, এই বীর চিত হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়।

অথচ সে সত্যি বীর ছিল। ছ' ফুট লম্বা। ডন বৈঠক করত। অনিচ্ছুক ভাবী-শ্বশুরকে সে সরাসরি বলেছিল, "দেবেন না মেয়ের বিয়ে? তাতে কিন্তু ফল ভালো হবে না।" নাকি পা ঠুকেছিল মাটিতে। ফলে

বিয়ে হল অনতিবিলম্বে। কিন্তু বিয়ের রাতেই স্ত্রী বলল, "একি ! বাড়িতে ফার্নিচার কই?" "নেই"—নায়ক সপ্রতিভ।—"দরকার হলে মেঝেতে ঘুমাব।" "তা তুমি ঘুমিও। তোমার দরকার হবে। আমাদের বাবা কষ্ট করে অভ্যাস নেই"। বলে মুখ ঘুরিয়ে শুল। পরের দিন ভোর না-হতে নববধূর অন্তর্ধান। তখন থেকে নায়ক ঐ মেঝেতেই শুয়ে আছে। কিছুতেই উঠতে চাইছে না। বিরক্ত করলে ছুরি বার করছে।

"না, না, খনোখুনি খুব খারাপ কাজ," আমি বলেছি আমার নায়ককে। "তাহলে নিজের বুকে দিই বসিয়ে?" বলে এমন করে ধরেছে ছুরি বুকের উপর যে আতঙ্কে আমি পাণ্ডুলিপিই ফেলেছি ছিঁড়ে।

আরো একজনের কথা বলতে পারি। এই নায়ক তার আফিসের সাহেবের জন্য গৃহশিক্ষক জোগাড় করতে না-পেরে জব্বর ধমক খেল। "আমাকেই দিন না," ইতস্ততঃ করে যেই বল, অমনি সাহেবের লাফিয়ে ওঠা। "ওঃ এই মতলব। নিজে ঢোকার ফন্দি?" ভদ্রলোক বাড়িতে ফিরলেন বিরস মনে। শোধ নেয়া দরকার। কিন্তু কার উপর? স্ত্রীর উপর ঝাল ঝাড়তে গেলে কি হাল হবে জানা আছে। চাকরকে বকলে চলে যাবে রাগ করে, তখন নিজেরই চাকর সাজা। কপাল ভাল, সেই সন্ধ্যাতেই বাড়িওয়ালা এলেন ভাড়া নিতে। ফেটে পড়ল নায়ক! "ভাড়াতো নিচ্ছেন, কিন্তু একি বাড়ি সাহেব! এতে মানুষ থাকতে পারে?" কিন্তু বাড়ীওয়ালার বিপরীত ভাব—বিনয়ে গলে যাচ্ছে, যেন আগুনের পাশে ঘি। "খুব অসুবিধা হচ্ছে বুঝি?" "অসুবিধা বলে অসুবিধা—আসুন না।—আসুন—দেখুন।" "না, দেখার দরকার নেই। আমিও তাই ভাবছিলাম, আপনাদের মত মানীলোকের কি এখানে মানায়"—একেবারে বিগলিত তিনি।—"তাই বলছিলাম কি, এ মাসের পনের থেকেই ছেড়ে দিন, কি বলেন?"

এখন? এখন কি করবেন এই নায়ক? এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। তিন দিনের মধ্যে বাড়ী তিনি পাবেন কোথায়? তাঁর স্ত্রী আবডাল থেকে কথোপকথন শুনেছে কিনা তাই বা কে জানে? তা হলে? ইনি কি যা-ইচ্ছে হচ্ছে করার তাই করবেন? হাউমাউ করে কেঁদে ফেলবেন বাড়ীওয়ালার পা দু'টি জড়িয়ে ধরে?

ঠেলাগাড়ির পেছনে

ঠেলাগাড়ির পিছনে রিক্শা আটকা পড়লে বিরক্তির আর অবধি থাকে না। নানা রকমের অভদ্র, অসভ্য প্রতিক্রিয়া শুরু হয় মনের ভেতর। রিক্শায় চড়ি তাড়াহুড়োর জন্য। বাসে ওঠা দুরাশা, স্কুটার দু দু এইরকমের একটা নিরুপায় অবস্থায় আমার সচরাচরিক রিক্শারোহণ। কিন্তু সেদিন সকালে ভারি ভাল লাগল। প্রসন্ন হয়ে উঠল মন। বোধ করি সুর বাজল কোমল গান্ধার।

রিক্শার সামনের ঠেলাগাড়িতে ঠেকি-দেওয়া তরকারী। ফুলের মত ফুলকপিরা থরেবিথরে ফুটে আছে। সে কী মধুর, ভুবনমোহন তাদের হাসি। তুলনাবিরহিত। টমাটোর ঐ রক্তিমাভা—ও আমি কি দিয়ে বোঝাই? অনুমান করি, প্রিয়ার অমন অধরের জন্যই যুগে যুগে প্রেমিক-পুরুষেরা জীবনযৌবন পণ করেছে। বেগুনের গায়ে যে আভা দেখলে ঠোঁট ভিজে আসে, ইচ্ছে হয় তেলেবেগুনে জ্বালিয়ে দিই বাসায় নিয়ে। কত করে সের বিকোবে কে জানে? আহা গৃহিণী না-জানি কেমন হাসতেন বটিতে ফেলে কুটতে পেলে। বাঁধাকপির খোঁপাবাঁধা শোভা দেখে নয়ন জুড়ালো।

গন্তব্যে পৌঁছবার ভয়ঙ্কর তাড়া ছিল আমার। কিন্তু তবু রিক্শায় বসে বসে আমি নয়নভরে দৃশ্যটা দেখলাম। মনে হল, দিনটা আমার যাবে ভাল।

সেই সঙ্গে নানান রকমের তাৎপর্য মুহূর্তে মুহূর্তে চমকে চমকে গেল আমার মনের কন্দরে। জীবনের যদি কোন শুভ অর্থ থাকে, উদ্দেশ্য যদি থাকে কোন বেঁচে থাকার, তাহলে মনে হল সে আছে এই খানে, এই

ঠেলা-গাড়িতে। জনসেবায় উদয়াস্ত নিয়োজিত কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানই বোধ হয় গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল রাস্তায়, ঠেলাগাড়ির একটা চাকা তাতে দেবে গেছে। সামনে থেকে জোরে-শোরে টানছে, পেছন থেকে আরেকটা লোক প্রাণপণে ঠেলছে। আর তার উপরে ঐ মনলোভা দৃশ্য, ঋতুর খাঞ্চাভরা উপঢৌকন। ঠেলা-ধাক্কায় ইতস্তত কাঁপছে।

যদি আমি শিল্পী হতাম, নিদেনপক্ষে কবি, জোর থাকত তুলির কি কলমের, তাহলে কল্পনায়-অনুভবে একাকার মিশিয়ে হয়ত এই স্বর্গীয় শোভাকে অনন্তকালের হাতে তুলে দিতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু কোনটাই নই, তাই স্বার্থপরের মত একা একাই ভোগ করলাম এ সৌন্দর্য। চকিতে একবার শুধু বাসনা হয়েছিল নেমে গিয়ে দু'হাতের আলিঙ্গনে যত পারি তরকারি তুলে রিক্‌শার পা-দানিতে সাজিয়ে রওয়ানা দিই ঘরমুখো।

শীতকে কেন আমি ভালবাসি—এ প্রশ্নের পুরানো একটা জবাব নতুন করে মনে এল, এসে চিত্তের প্রশান্তির উপর দিয়ে হাল্কা মেঘের মত ভেসে ভেসে বেড়াল। আমার কাছে শীত ঋতুদের রাজা। গরমে যখন ঘামি, বর্ষায় ভিজি, তখন মনের ভেতর একটা জিজ্ঞাসাই আকুলিবিকুলি করেঃ কবে আসবে, শীত, মায়ের স্নেহের মত কুয়াশা নিয়ে। মায়ের স্নেহের মত পিঠে হয়। রোদে-পিঠ দিয়ে বসে পিঠে খাবার সেসব দিন আর আসবে না জানি, তবু আবহাওয়াটাতো আসে দেখি। জীবনের চারদিকে শুধু চোখ-রাঙানো আর ধমকাধমকিই স্নেহ খুঁজে পাই না। ক্ষণিকের জন্য হলেও শীত এসে অভাবটা ঘোচায়, স্নেহের একটা পুলকিত পরশ বুলিয়ে দেয় গায়ে। সঙ্গে দেয় খাঞ্চা সাজিয়ে তরিতরকারি। জানি, ঠেলাগাড়ির ঐ তরকারি পাকের ঘরে নিয়ে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়। ঠেলাওয়ালাদের চেয়ে কিছু কম পরিশ্রম হবে না আমার। দু'টো লেপ ও কয়েকজন বালক-বালিকার পুস্তক ক্রয়ে গলদঘর্ম হয়েছি—এও সত্য। শীতের কাপড় কেনাই হয়নি, তার বাজারে আগুন জ্বলছে শোনা গিয়েছিল। গিয়ে দেখি, গুজব মিথ্যা নয়। ভয়ানক গরম লাগায় পালিয়ে বেঁচেছি। ঐ তাপকে স্মরণ করে উত্তপ্ত থাকা কঠিন হবেনা আশা করছি। তবু শীতকেই

সবচেয়ে বেশী পছন্দ আমার। শীত এলে খেজুর গাছের মত অবস্থা হয়—ভেতরটা মিষ্টি রসে সিক্ত হয়ে ওঠে।

ষড়ঋতুর লীলাভূমির দেশ নাকি এটা। সে গুজব শুনেছি অনেক, দেখেছি অল্প। জীবনে যা দেখেছি, ঋতুদের পক্ষে তা লীলাখেলা হতে পারে, হোক কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমার কাছে অধিকাংশ সময়ই আচরণটা অত্যাচার ও গঞ্জনা ছাড়া কিছুই মনে হয়নি। বালক ও ব্যাঙদের মত ব্যাপার—কারো খেলাধূলা মৃত্যু কারো।

গরম যখন আসে, আমাদের গলিটাকে মনে হয় খঞ্জ ভিখিরি, শুকনো রুক্ষ নির্মম গলায় চীৎকার করছে, অথবা যেন পীড়িত কুকুর, লম্বা জিহ্বা বার করে হাঁপাচ্ছে। ঘরের ভেতরটা স্টীমারের এঞ্জিন রুমের মত দ্‌পদ্‌প করতে থাকে, আর আমরা ধানের মত সিদ্ধ হই। রাতের ঘুম বিকারগ্রস্ত রোগী। অস্বস্তিতে জীবনকে মনে হয় এ অতিদীর্ঘ দুঃস্বপ্ন। বৃষ্টির পানিতে গলিটা আর রাস্তা থাকে না, নর্দমা হয়ে যায়, থিক্‌থিক্‌ করে কাদা, ছল্‌ছল্‌ করে পানি। জামা-কাপড় নোঙরা হয়। মশায় কামড়ে দেয়, জ্বরজারি লেগেই থাকে।

'ঋতুরাজ' বসন্ত কখন আসে, কি করে আসে, কোথায় আসে—সে-খবর বড় একটা রাখি না। কবি ও গায়কেরা যে-সমস্ত জায়গায় থাকেন সেখানে শুনি বসন্তে বনে ও মনে শুধু মধু গুন গুন, তার ফুল ও হিল্লোলে প্রাণ মাতোয়ারা। হতে পারে তাঁদের বাড়ীতে বড় বড় বাগান আছে, হয়ত তাঁরা বাগানেই থাকেন, কিন্তু আমরা যারা পুরানো ঢাকার প্রাচীন গলির মানুষ তারা রঙ দেখি না, ফুলও নয়, হিল্লোলও নয়। শুধু হঠাৎ একদিন শোনা যায় শহরে রোগ এসেছে, বসন্ত দেখা দিয়েছে। তখন আঁতকে উঠি, প্রাণ সত্যি সত্যি শিহরিত হয়, ভয় হয় বনে বা মনে না এসে বসন্ত বুঝি গায়েই আসে। ঐ বুঝি 'বসন্ত এলরে'। একবার তার জয়ের মালা আমার নিজের মুখেই ফুটেছিল, বেশ দগদগে হয়ে, অক্ষয় হয়ে নেই—এই যা রক্ষা।

শুধু শীতকে দেখি ধীরে ধীরে অতিপ্রশান্ত পদক্ষেপে আসে স্নেহ-বাহিত তরকারিশোভিত হয়ে। তখন আমরা বাক্স-পেটরা-আলমারী খুলে

ভাঁজ-করে-রাখা ভালো ভালো কাপড়-জামা বার করে নিই, তারপর গায়ে চাপিয়ে শীতকে ঘরে নিয়ে আসি। ঘরের ভেতরে লেপ-তোষকের আস্তরণে আধভাঙ্গা চৌকিগুলো ততক্ষণে উপাদেয় বিছানায় পরিণত হয়েছে। যেন উৎসবে শরীক হয়েছি আমরা। দারিদ্র্য যেটুকু তা চাপা পড়েছে। যেটুকু সম্পদ আছে সেটাই চোখে পড়ছে। ঘুম ভাঙে দেরীতে, শুতে যাই আগে আগে। লেপের নীচে যখন গুটিগুটি শুই কবি-কল্পনার ইচ্ছা-মৃত্যুর মত মধুর মধুর ঘুম নামতে মুহূর্ত বিলম্ব হয় না।

আর সেই অলস, মন্থর, কিঞ্চিৎ বিলাসী জীবনযাত্রার আভিজাত্যের কাছে লজ্জা পেয়ে এই গলির লোলজিহ্বা কুকুর ও উৎকট নর্দমাটা গা ঢাকা দেয়। গলিটাকে কখনো মনে হয় বনেদী জমিদারের দালান বাড়ি, মধুর একটা আয়েশে নিমগ্ন, অর্ধনিমিলিত চোখে স্বপ্ন দেখছে বুঝি। আবার কখনো ভাবি যেন সেজেছে শাহেনশাহ, তোয়াক্কা করেনা কারো, আপন খেয়ালে চলে। দেখে হাসি পায় না। ভালো লাগে। কেননা, শীতকালে আমিও কল্পনাপ্রবণ হয়ে পড়ি, নানান রকমের কথা অন্যমনস্কে ভাবি। আর ভয় পাই কখন না-জানি গাড়লের মত বসন্ত এসে উষ্ণ শ্বাস ফেলে নষ্ট করে দেয় সব। সেই গাড়লইতো ক্রমশঃ গ্রীষ্মের গরিলা হয়ে ওঠে। শীতকে যারা মৃত্যুর ঋতু বলবেন তাঁদেরকে বলবো অন্য-ঋতুতে—বসন্তে, গ্রীষ্মে, বর্ষায়—আমাদের গলিটাকে একবার দেখে যাবেন ভাই।

ইতিমধ্যে পথে দেখি হৈ হৈ কাণ্ড শুরু হয়েছে। যানবাহনের বড় এক মিছিল দাঁড়িয়ে গেছে পিছনে। হর্ণের দাপাদাপি, গলাবাজির হুলুস্থুল। আমার রিকশাওয়ালা বুদ্ধিমান লোক, সে আসন থেকে নেমে টেনে নিয়ে গেল রিক্‌শা। আমি শেষবারের মত তাকিয়ে দেখলাম। অতসব গণ্ডগোলের ভেতর তরকারির স্তূপটা কেমন স্থির, অবিচল হয়ে বসে আছে। দৃশ্যটা দ্বিতীয়বার ভাল লাগল।

কেউকেটা

এবার দেখি সামনে পড়েছি ঠেলাগাড়ির। গলিতে ঢুকব এমন সময় প্রায় নিঃশব্দে এসে চাপা দিয়েছিল আর-একটু হলে। ভাল সামনে উঠেছি কি উঠিনি দেখি গাড়ির একবারে মাঝখানকার স্তব্ধতায় চাঞ্চল্য একটা। আরোহী একজন নিশ্চিন্তে বসেছিল, হাত তুলেছে আমাকে দেখে।

চিনতে পারিনি প্রথমে। আলো আঁধারির আবছায়া একটা ছিল, বাতি জলছিল না রাস্তায়, ঠেলাগাড়ির উপরের হ্যারিকেনটা নিবু নিবু। কিন্তু দোষ বাতির নয়। রমজান আলী মুন্সিকে আমি কিছুতেই আশা করিনি এইখানে, এই শহরে, এই ঠেলাগাড়িতে।

গাড়িটা চলে গেল। সামনে আছে একজন, পেছনে আর এক-জন। রমজান আলী মাঝখানে। হ্যারিকেনের আলোটা ছোট ও অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল একটু একটু করে।

তারপর আমি হাঁটা শুরু করেছি। কিন্তু রমজান আলীর হাসি দেখি আর আমার সঙ্গ ছাড়ে না। একটুকরো অতিবিষণ্ণ হাসি, আমি দেখেছি কি-দেখিনি। কিন্তু এখন দেখি সঙ্গে চলেছে, আমি যে দিকে যাই সে-দিকেই। আমার অন্যমনস্কতা কেটে গেছে।

রমজান আলী আমাদের গ্রামের লোক। আমার দাদীকে মা ডাকত, সেই সুবাদে চাচা আমার। আসলে নৌকা বাইত, তাও নিজের নয়, ভাড়া-করা, ভাড়া নিয়ে ভাড়া খাটত গ্রামে। সেই

রমজান আলী শহরে এসেছে। এখন, এই সন্ধ্যায় সওয়ার হয়েছে ঠেলাগাড়িতে। এত সব খবর আমার জানা ছিল না।

কিন্তু ঐ হাসি যে কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়ছে না। গলি পার হয়ে বাসায় এসেছি, খেয়েছি, শুয়ে পড়েছি বিছানায়। দেখি আছে সেই হাসি। পরের দিন সকালে হাত-মুখ ধুচ্ছি যখন পাশে দেখি রমজান মাঝিকে। তখনো উপস্থিত বিষণ্ণ সেই না-ছোড়বান্দা হাসি।

খেয়াল হল রমজানকে আমি স্বপ্নে দেখেছি। হয়ত দেখিনি। হয়ত সেটা কল্পনা। কিন্তু তবু মনে হল সে এসেছিল। হ্যারিকেন হাতে। দরজায় দরজায় টোকা দিচ্ছে। 'আমার ছেলেকে দেখেছেন? আমার ছেলে? সাহেব আলী।' 'কেন? কত বয়স তার? কি বৃত্তান্ত? হারিয়ে গেছে কি?' 'বয়স অল্প নয়। নাবালক নয় মোটেই। হারায় নি, পালিয়ে গেছে আমার স্বর্বস্ব নিয়ে, গা ঢাকা দিয়েছে কোথাও, এসেছিল কি এ-দিকে?'

সাহেব আলী নাম নয়। অন্য কিছু হবে। কিন্তু এখন সাহেব-সুবো হয়েছে তাই ঐ নাম দিয়েছে রমজান মাঝির সাথের লোকেরা। যেন ভ্রূকুটি করছে সকলে মিলে।

আপিসের পথে বার হয়েছি, সঙ্গে সেই রমজান আলী। 'নসিব, নসিব আমার'—কপাল চাপড়ে বলছে বুড়ো। দেখি দগ্‌দগ্‌ করছে কপালের সেই দাগ্‌টা, যেটা আমরা ছেলেবেলায় দেখতাম, গা কাঁটা দিয়ে উঠত অদৃশ্য ডাকাতদের কথা ভেবে।

নসিবই বটে, নইলে দারোগা সাহেবের সঙ্গে ঐ রকম যোগা-যোগটা ঘটবে কেন। না, ডাকাতির ঘটনা নয়, ঝড়েরও নয়, নয় নৌকা-ডুবি। সাঁতরে বাঁচায় নি কাউকে, লড়াইও করতে হয়নি। বরং বিপরীত ঘটনা সম্পূর্ণ। অতিবেশী সাধারণ। সরু ও লম্বা এক নদী দিয়ে নৌকা বাইছিল রমজান মাঝি। নৌকাতে সপরিবারে ছিলেন দারোগা সাহেব। ঢেউ নেই, স্রোত নেই, বাতাস নেই। শুধু অন্তহীন, অবিরাম নৌকা বাওয়া। রোদ ছিল আকাশে। হাই তুলছিলেন দারোগা সাহেব। অন্যমনস্কভাবেই জিজ্ঞেস করেছিলেন কথাটা। 'মাঝি, ছেলেমেয়ে

কয়টি ?' 'একটি'। বলে ছেলের কথা বলেছিল রমজান। বাড়িয়েই বলেছিল, যেমন বলত। জেহানের কথা, বিস্তায় উৎসাহের কথা। 'তা পাঠিয়ে দিয়োতো একদিন তোমার ছেলেকে।' অন্যমনস্কতাই বোধ করি দায়ী, এই মন্তব্যের জন্য। হয়ত হাই তুলেছিলেন বলার মধ্যেই। 'হ্যাঁ পাঠিও, তোমার এত গুণী ছেলে যখন', ভেতর থেকে বলেছিলেন দারোগা সাহেবের স্ত্রী। শুনেছিলেন কথা, একঘেঁয়েমি কাবু করেছিল তাঁকেও। আর ঐ যে বললেন কথা তাতে পরিহাস ছিল, না-কি ছিল আগ্রহ কেউ বলতে পারবে না. কোন ঐতিহাসিক নয়, হয়'ত তিনি নিজেও নন।

পাঠায়নি। নিজেই নিয়ে গিয়েছিল রমজান মাঝি, নৌকা বেয়ে। এই ঘটনা না-ঘটলে সাহেব আলীর জীবনেতিহাস হয়ত লেখা হত ভিন্নভাবে। অন্য কোন স্রোত চলত, হয়ত বা চলতই না, তার নামও হত না সাহেব আলী।

সেই যে গেল, আর ফিরল না ছেলে। পাস করল, একটার পর একটা, চাকরি পেল। বিয়ে করল, দারোগা সাহেবের ছোট মেয়েকে। পর হয়ে গেল আপন ছেলে। ওর মা যে মারা গেল সে তো ঐ ছেলের শোকেতেই। সবাই জানে সে-কথা। সবাই আফশোষ করে।

'খুনী! খুনী! খুন করেছে আমাকে।' দেখি কানের কাছে দাঁড়িয়ে বলছে রমজান মাঝি। দগ্‌দগ্‌ করছে কপালের দাগ। অসম্ভব জ্বলে উঠেছে চোখ। কথার মধ্যে আগুনের হল্কা। যেন একটা মাত্র উদ্দেশ্যই অবশিষ্ট আছে বুড়োর জীবনে, ধরবে, ধরবে ছেলেকে, বদলা নেবে খুনের।

ঐ যে বলেছে খুনী খুনী ঐ কথাটা রিন্‌ রিন্‌ করে কেবলি বাজছে আমার কানে। পথে বাজল, বাজল আপিসে। ফিরছি বাসায় বাসে চড়ে, গম্‌গম্‌ শব্দ চারপাশে। তার মধ্যেও শুনি রমজান মাঝির সেই স্বর। এক সময়ে হঠাৎ দেখি, সাহেব আলী নিজে দাঁড়িয়ে ঐ বাসের মধ্যে, আমার একেবারে গায়ে গা ঘেঁষে। এক হাতে রড্‌ ধরেছে, অন্য হাতে রুমালে-বাঁধা বাজার। আমি বসতে পেয়েছি, সাহেব

আলী পায়নি, বাস যখন লাফ্-ঝাঁপ দিচ্ছে তখন মনে হচ্ছে একেকবার ছিট্কে পড়বে আমার গায়ের উপর।

সাহেব আলীকে কোনদিন দেখিনি আমি, কিন্তু সে-দিন স্পষ্ট দেখলাম, পড়ন্ত বিকেলের আলোতে, বাসের ভেতরে। হয়ত আপিস করে, টুইশন সেরে, বাজার নিয়ে ফিরছে সাহেব আলী। পৌঁছবার অপেক্ষা মাত্র, পৌঁছলে আর সাহেব থাকবে না, সাত চোরের এক চোর হয়ে যাবে এক-নিমেষে। ঢুকবে চোরের মত, ডাকবে মেয়ের নাম ধরে। আর তড়বড় করে তেড়ে আসবে সাহেবের বউ, দারোগা সাহেবের মেয়ে। রুমালের মাছ হয়ত পচা বার হবে। নইলে হয়ত পাড়ার ছোকরাদের সঙ্গে মারপিট করেছে তার ছেলে। এমনও হতে পারে যে দারোগা সাহেবের বড় মেয়ে এসে গেছে বিকেলে। গলিতে ঢোকেনি তাদের গাড়ি। মোড়ে থামিয়ে, শাড়ী উঁচিয়ে, কাদা ডিঙিয়ে কোন মতে এসেছে বাড়িতে। হাজার হোক বোন তো। যে-সব মন্তব্য করে গেছে তাদের প্রত্যেকটি কয়েক গুণ তপ্ত হয়ে এগিয়ে আসবে সাহেব আলীর দিকে। তবু সহ্য হয়, গঞ্জনা তবু সওয়া যায়, অসহ্য হবে তখন যখন বন্ধ করে দেবে কথা। যখন সে দেখবে সমস্তটা বাসা একটা প্রেতপুরী— তার জন্য।

সাহেব আলী দেখি আমিই হয়ে গেছি। এক হয়ে গেছি তার সঙ্গে, যাকে দেখিনি কখনো, কোনদিন।

পরের দিন, ফেরার পথে, আবার খুঁজলাম তাকে। দেখি, হ্যাঁ ঠিক এসেছে। উঠতে পারেনি বাসে, চেষ্টা করছে প্রাণপণ। অত্যন্ত বিপন্ন চেহারা। হ্যাণ্ডেল পর্যন্ত ধরেছিল। ঠেলা-ধাক্কায় পিছিয়ে গেল। পড়েই গেল যেন। ছেড়ে দিল বাস। তবু দৌড়াল খানিকটা। পারল না, পারল না সাহেব আলী উঠতে সেই বাসে। আমার মন বলছিল, পারুক সে, উঠুক সে, তার দরকার খুব ওঠার। কিন্তু কার কথা কে শোনে। সে পড়ে রইল পেছনে।

সেই রাত্রে আবার দেখা রমজান মাঝির সঙ্গে। বলছে, 'কি ভাতিজা, তুমি নাকি খোঁজ পেয়েছ সাহেব মিয়ার? বল, কোথায় আছে

সেই বদমাশ?' বলে খুব একটা খারাপ গালি দিল। সশব্দে। দেখি ধক্ ধক্ করে জ্বলছে তার চোখ।

দেখি সাহেব আলীও এসেছে। কী যেন বলতে চাচ্ছে আমাকে। 'ও তোমাদের বাপ-বেটার ব্যাপার মিটিয়ে নাও নিজেদের মধ্যে।' বলে পাশ ফিরে শুয়েছি কি-শুইনি, শুনি ভীষণ কোলাহল। তাকিয়ে দেখি সাহেব আলী দৌড়াচ্ছে। পেছনে তার বাপ। ধর ধর। লোকজন ছুটেছে পিছনে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সাহেব। —তারপর খবরের কাগজে বেরিয়েছে সেই বিবরণ। সাহেব আলীর বৃত্তান্ত। একটি সামাজিক চিত্র। বিবর্তনের ইতিহাস, অসঙ্গতির ব্যক্তিরূপ -ইত্যাদি, ইত্যাদি। বড়-করে সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখেছে কাগজে। খুব পিটিয়ে দিয়েছে পাবলিক। একেবারে গণ-পিটুনি। হাসপাতালে গিয়েছিল। বাসায় ফিরে বলতে পারেনি। ব্যাপার কি স্ত্রী জেনেছে পরের দিন, কাগজ পড়ে।

দেখি আদালত বসেছে, ঘর-ভর্তি লোক। রমজান আলী নিজেই বলছে নিজের কথা। ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ, অতিবেশী উত্তেজিত। মুখের দাঁড়ি শূন্যে উড়ছে। ঘুষি দেখাচ্ছে, পেছাচ্ছে একবার, আবার যাচ্ছে সামনে ছুটে। জনতার মধ্যে উত্তেজনা। বিচারক টেবিল পিটিয়ে শান্ত করতে পারছেন না অবস্থা।

তারপর সাহেব আলী উঠল অত্যন্ত ধীরে ধীরে। তারও উকিল সে নিজেই। বিচারককে বলল না কিছু। তাকালো তার বাপের দিকে, আর বলল খুব শান্ত নম্র গলায়, 'তুমি তো বাবা তবু হাসো, আমাকে কি কেউ হাসতে দেখেছে কখনো?'

তাকিয়ে দেখি একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেছে সাহেবের বাপ।

বনভোজন

আমি বনের ভক্ত নই, ভোজনেও কম। বনভোজনে আমার তাই এমন-কোন ফূর্তি লাগে না। আহ্লাদ জাগে না চিত্তে। তবু প্রতি বছর আপিসের সহকর্মীদের সঙ্গে আমাকে বনে যেতে হয় ভোজনে। এবারেও হয়েছে। গেল সপ্তাহে হৈ-হল্লা করে এ-কর্তব্যটি সম্পন্ন করা গেছে।

বাস বোঝাই লোকজন ও লটবহর নিয়ে শহর থেকে মাইল বিশেক দূরে যে জায়গাটায় আমরা অবতরণ করেছিলাম সেটাকে বন বলা কঠিন। তবু বেলাটা সকাল, ওদিকে ইট-পাটকেলের মারকাট নেই, বরং সর্ষে ক্ষেত আছে ছড়ানো—তাই বাস্তবের সঙ্গে মনের মাধুরী মিশিয়ে কোন-মতে বনের একটা চেহারা খাড়া করেছিলাম মনে মনে। এমন কি রবিবারটা যে মাঠে মারা গেল, অহরহ-দেখা অতিবেশী-চেনা মুখগুলোকে যে ছুটির দিনে আবার দেখতে হচ্ছে এবং নগদ দশটা করকরে টাকা মাসুল দিতে হয়েছে আমাকে—এইসব অস্বস্তিও চাপা পড়েছিল। এককথায় ভালই লাগছিল সবুজ ঘাসে পায়চারী করতে। এমন সময় হঠাৎ শুনি একটা কলরোল। লাউড স্পীকারে কে বা কারা যেন চা-চা না ঝা-ঝা, কি-একটা হল্লা চাপিয়ে দিয়েছে। বাসে আসার সময় ডেকচি-পাতিল, ট্রাঞ্জিষ্টর, ক্যামেরা, এমন কি সহযাত্রীদের কাপড়-জামাও চোখে পড়েছিল। রেকর্ড-প্লেয়ার সঙ্গে যাচ্ছে তাও জানতাম। কিন্তু লাউড স্পীকার কখন কি করে এল, টের পাইনি। প্রস্তুত ছিলাম না বলেই হয়ত ধাক্কাটা বেশী জোরে লাগল। ভাবলাম, যাই, দৌড়ে যাই, গিয়ে থামাই এই অত্যুৎসাহীদের, বুঝিয়ে বলি, বনে যদি এসেছি তো বনেই থাকি, শহরকে আবার টেনে আনা কেন শুধু শুধু! গেলামও দৌড়ে, কিন্তু অকুস্থলে পৌঁছার আগেই দেখি দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড। নবীন

সহকর্মীদের কয়েকজন, যারা লাউড স্পীকারের ঐ হট্টগোলের জন্য দায়ী, রেকর্ড-প্লেয়ারে রেকর্ড চাপাচ্ছেন আর সেই সঙ্গে আপন মনে ঠ্যাং দুলিয়ে শরীর কাঁপিয়ে তালে তালে নৃত্য করছেন। দেখে সাহস পাইনি এগুতে, বরং মনে হয়েছে পলায়নই শ্রেয়ঃ।

প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলাম। একটাই উদ্দেশ্য, আমাকে পালাতে হবে, কান ও প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে হবে এই শব্দের বাইরে :

শব্দ যেখানে কম, তেমন একটা জায়গা পেয়ে আনমনে হাঁটছি। হঠাৎ দেখি, পাকা ফলটির মত টুপ করে একটা বল এসে পড়েছে আমার পায়ের কাছে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বামাকণ্ঠে ভীষণ-মধুর হাসি। পরের মুহূর্তে যাঁদের দেখলাম, চোখের ভুলে ধারণা হয়েছিল, তাঁরা বুঝি লাফিয়ে নেমেছেন পাশের গাছগুলো থেকে, বা হয়ত তাঁরা বনের পরী, খেলতে এলেন কুঞ্জবনে। আমার স্তম্ভিত বিব্রত দৃষ্টির উপর হর্ষের এক পশলা ইতস্তত-নুড়ি বর্ষণ করে চোখের পলকে তাঁদের অন্তর্ধান। আর সেই অপসৃয়মাণ নারী-মূর্তি ক'টির দিকে আপাদমস্তক তাকাতেই দেখা গেল সব ক'জনের মাথাতেই বাবুই পাখির বাসা আছে, জামাকাপড়ে আছে পশুপাখী বনবাদাড়ের ছবি, পাজামায় ঘটেছে অতিরিক্ত কার্পণ্য জুতো সকলেরই কৃশ। আরো একটু দূরে চোখ চালিয়ে দেখি হ্যাঁ, খেলোয়াড়ই বটে। ক্রিকেট খেলছেন মহিলারা। গুণমুগ্ধদের নাতিদীর্ঘ ভিড়ও জমেছে একটা।

বুঝলাম এই বিজনে একা নই, সঙ্গী আছে। মেয়ে-কলেজের ছাত্রীরা বোধ হয় এসেছেন বনবিচরণে। লোভ হল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ ক্রীড়া অবলোকন করে নিই। সেই বেশরম বাসনাকে দাবিয়ে রেখে পথ হাঁটছি, কি করি আজ ভেবে না-পাই গোছের ভাব একখানা। দেখি আরেক দুর্লভ দৃশ্য। গুচ্ছের ছেলেমেয়ে লেগেছে দু'জন ভদ্রমহিলার পিছনে। 'মেম সাহেব, কদ্‌বেল নেবেন?' 'চোখে ওটা কি রে!' 'ইস শাড়ীটা সিলিক'' 'কানের দুলটা দেখ!' এই ধরনের অগোছালো সব মন্তব্যের ঘা খাচ্ছেন যে মহিলা দু'জন তাদের শ্রান্ত চলন ও বিরক্ত

মুখের সঙ্গে তাড়া খাওয়া হরিণীর তুলনা যদিও কষ্টকল্পনা, তবু আমার প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল ঝাঁপিয়ে পড়ি ঐ অপোগণ্ড অকালপরিপক্ব বাহিনীর উপর, উদ্ধার করে আনি বিপন্না নারীকে, সার্থক হোক আমার নরজন্ম।

কিন্তু ইচ্ছারা যদি ঘোড়া হত, তবু না-হয় চড়া যেত। ইচ্ছারা তো রংধনু—দেখা দেয়, ধরা দেয় না। অগত্যা বীরত্ব দেখানো স্থগিত রেখে দুঃখ দৃশ্যটাই বরং দেখলাম, একপাশে সরে দাঁড়িয়ে। মহিলারা বোধকরি কলেজের শিক্ষিকা। ছাত্রীদের নিয়ে এসেছেন। ঐ ক্রিকেট খেলোয়াড়-দের এঁরাই শিখিয়েছেন, এদেরি হাতে যে ওদের বেশভূষার শিক্ষা, সেটা অবশ্যি না বলে দিলেও টের পাওয়া যায়। চোখে দু'জনারই গগল্‌স, শাড়ীর লতাপাতা গা পেঁচিয়ে উঠেছে। খুঁটিনাটি বর্ণনা নাইবা দিলাম, তবে চুলের বাঁধন থেকে গোড়ালির ভঙ্গিমা পর্যন্ত কোথাও কোন অসঙ্গতি নেই। ওজনে-ধরনে সমস্তটা একই মাপের। আধুনিক বিশ্বের এই দু'জন ভ্রাম্যমাণা প্রতিনিধি বুঝি বনে বিহার করছিলেন, তখনি হয়ত বা গ্রামের বালক-বালিকা তাঁদের চিনতে পেরেছে। এবং পিছু নিয়েছে।

উপরিপাওনাগুলো মন্দ লাগছিল না, 'বনে নয় মনে মোর পাখী আজ গান গায়'—এই রকমের একটা কলিও বোধহয় গুনগুনিয়ে এসেছিল আমার ঠোঁটে, শীতের সেই দুপুরে, কাঁচা মাটির বুনো পথে হাঁটতে গিয়ে। এমন সময় আচমকা আরেক বিপদ। শোনা গেল, কোথায় যেন খুনে-খুনি কাণ্ড বেঁধেছে! লাউড স্পীকারের যে-শব্দ থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছিলাম তার চেয়েও জোরে কোথায় যেন হিন্দী গান হচ্ছে। প্রেমিক প্রেমিকার দ্বৈত জগঝম্প। উঁকিঝুঁকি দিয়ে জানা গেল অনেকগুলো মোটর গাড়ীর বেস্টনীর ভেতর আমার তরুণ সহকর্মীদের চেয়েও তরুণ একদল ছোকরা আফ্রিকার কি কোন্ দেশের জানি না, সাঁওতাল পরগণারও হতে পারে, নাচ নেচে যাচ্ছে গানের তালে তালে। অতএব আবার আমার ফেরারী হওয়া।

সহকর্মীদের ভিড়ে যখন ফিরে এলাম শুনি কিছু কিছু দৃশ্য তাঁরাও দেখছেন। বনভোজনরত ছেলে ও মেয়েতে যোগাযোগের ঘটনাও

চোখে পড়েছে, জোড়ায়-জোড়ায় তাদের পথে-বিপথে হারিয়ে যেতে দেখেছেন বলেও সাক্ষ্য দিলেন দু'য়েকজন।

বিকেলের দিকে যখন খাবার এল. প্যাতে ততক্ষণে ক্ষিদে মরে গেছে। ওদিকে খাদ্যদ্রব্যটিকে ভদ্রতা করে বিরিয়ানি বলা যায় বটে কিন্তু তাতে তার স্বাদ তো বাড়ে না। ওরই একটা শক্ত মাংসপিণ্ড নিয়ে যখন দাঁত ও হাতে টানাহেঁচড়া চলছিল তখন আবার আর-এক দুর্ঘটনা। মাংসের একটা আঁস দিব্যি দাঁতের ফাঁকে গলে গিয়ে কায়েমী হয়ে বসে রইল। মাংসের উপর যত না তার চাইতে বেশী রাগ হ'ল নিজের অন্যমনস্কতার উপর। পরে খেয়াল করলাম দোষ মাংসের নয়, অন্যমনস্কতার নয়, দোষ সেই বেয়াড়া প্রশ্নের যা আমাকে অন্যমনস্ক করেছিল।

কিন্তু আমি সে-সব প্রশ্নের কথা বলতে চাই না আপনাদের, এ-সব হামেশাই ওঠে, লোকের মুখে, কাগজে-পত্রে, বক্তৃতায় হরদম শোনা যায়। এসব প্রশ্নের পেছনে উচ্চমন্যতা থাকে, ভাব থাকে এই যে উঁচুতে আমরা অনেক অনেক উঁচুতে। আর ঐ যে প্রশ্নই সে তো উঁচুত্বের নিশানা।

তবে আর একটা কথা বলতে হয়, অনুভবের কথা। ফিরছে বাস। প্রশ্নটা উঁকিঝুঁকি দিয়ে উচ্চমন্যতার গোপন লোভের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে মনে হয় ভেতরে ভেতরে। ক্লান্তি তখন সমস্তটা বাস জুড়ে। একবার মুখোমুখি বসে আছেন যে-সহকর্মী সকালে তাঁর ভিন্ন চেহারা ছিল, এখন অন্য। স্ফীতোদর তিনি, বেশ কিছুটা—অন্যদের তুলনায়। এখন তাঁর চোখ ঢুলু ঢুলু। মনে হয় গড়িয়ে পড়বেন আমার গায়ের উপরে। নাক ডাকছে যেন শুনেছি, বাসের গর্জনের মধ্যেও। খুব দৌরাত্ম্য গেছে বেচারার, শরীরের উপর দিয়ে। ফুটবলের চেয়ে অনেক বেশী ছোটাছুটি পড়েছে তাঁর। এখন আর স্থির থাকতে পারছেন না আসনে। নবনীতা নেমেছে শরীরে, আনন্দিত অবসাদ। ঝাপসা-ঝাপসা কেমন-যেন চোখ। যেন ফিরে ফিরে যাচ্ছেন তাঁর ছেলেবেলায় —তন্দ্রায় মধ্যদিয়ে, আমাদেরকে দিব্যি ফাঁকি দিয়ে আধো-আলো

আধো-অন্ধকারে, বিকেলের মৃদু-মন্দ আবছায়াতে। হাসি-ঠাট্টার অনেক দূরে এখন তিনি।

দেখি ক্লান্ত আমিও। দেখি ডাক এসেছে আমারো। হানা দিয়েছে সেই-ডাক সমস্ত অস্বস্তি, বিরক্তি, দাঁতের মাংস, মনের প্রশ্ন, পথের ধুলো সব ছাপিয়ে, পার হয়ে, ঘুমের মধ্যে, বুকের মধ্যে যেগাঢ় গভীর ঘুম আছে সেইখানে গিয়ে হানা দিয়েছে। মনে হল আমি নেমে পড়ব, শেষে দৌড় দেব যে-কোন মুহূর্তে। সত্যি সত্যি ভয় লাগল আমার খুব। আমি শক্ত করে চেপে করলাম সীট। সে ভারি বিড়ম্বনা হবে—মাঠে নেমে দৌড় দিলে।

আরোগ্যলাভের ইতিবৃত্ত

ঘুমালে যে নাক ডাকে আকরামুজ্জামানের হৈ হৈ রৈ রৈ করে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি তার আগে জানা ছিল না। তা অনেক কিছুইতো জানা ছিল না। নিমজ্জিত ছিল অন্ধকারে—তার বিয়ের আগে। নিজের দামটাও ঠিক জানত না সে। উন্নতি করেছে, আরো করবে। প্রাইভেটে এম. এ দেবে এই রকমের বন্দোবস্তও পাকাপাকি করে রেখেছে, এবং অন্যসব পরীক্ষায় যেমন আটকায়নি, ডিঙ্গিয়ে গেছে, বলতে গেলে আঁচড়ও লাগেনি গায়ে, এম. এ'তেও যে তেমনটি না-হবে এমন কোন কারণ জানা ছিল না আকরামুজ্জামানের। জায়গা কিনেছে জয়দেবপুরে, ইনসিওরেন্স একাধিক কম্পানীতে। কিন্তু তবু নিজের দাম যথার্থ জানত না সেটা স্বীকার করতে হল তাকে। মধ্যস্থতা করেছিলেন যিনি ওর বিয়েতে তিনি আকরামের কিছুটা নিকটের এবং পাত্রীর অনেকটা দূরের আত্মীয়। এটা চাই ওটা চাই করতে উদ্যত হয়েছে দেখে ভদ্রলোক সরাসরি জানিয়ে দিলেন যে তাহলে তিনি নেই এই সম্বন্ধের মধ্যে। তখন আকরাম নিজের দাম সম্পর্কে যে-একটা ধারণা খাড়া করেছিল সেইখান থেকে নেমে এসে ঘরে তুলল বউকে।

বিবাহোত্তর দ্বিতীয় রাত্রিতে জানালা-দিয়ে-আসা মৃদু চন্দ্রালোকে একটা বড় সত্য আবিষ্কার করল আকরাম। শুনল দুরন্ত হাঁপরের অনিবার ওঠা-নামা চলছে কামরার ভেতরে। নাক ডাকাচ্ছে স্ত্রী। ভালো লাগল, খুব ভালো লাগল আকরামের। দোতালায় ছোট ফ্লাট বাড়িতে ফুলের কোন ব্যাপার ছিল না, কিন্তু সেই একরত্তি মেয়ে, ফার্স্ট ইয়ারে উঠেছিল

সঙ্গ, তাকে ফুলের মতই মনে হল তার। রীতিমত গন্ধ পেল শুঁকতে, বাসি কাপড় থেকে, প্রসাধনের উপকরণ থেকে, নাসিকাধ্বনির শব্দ থেকে উঠে আসছে ফুলের একটা মিলিত সুবাস। আহা, পুষ্পের মত নিরীহ ও নিষ্পাপ, যেন ছিঁড়ে আনা হয়েছে বাগান থেকে, এখন আছে ফুলদানিতে, গন্ধ দিচ্ছে, দিলেই হয়, যেন শুকিয়ে না-যায় সংসারের তপ্ত ক্ষিপ্ত প্রবল হতশ্বাসে। আকরামের মন ভরে উপচে পড়তে চেয়েছে আমোদে। অভিভাবক বল, আর মালিকই বল, অথবা বল ফুলদানি সবই সে—সে-ই, আর-কেউ নয়, অন্য-কেউ নেই, আকরামুজ্জামান ছাড়া।

তারপর ঐ ধ্বনি বার বার শুনেছে। যতবার শুনেছে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে ভেতরে ভেতরে—সব কাজ ভুলে। কাঁচা বাজারে যখন স্ত্রী'র প্রিয় শাকটি কিনে তুলেছে থলিতে, তখন, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে যখন দাম-করেছে স্ত্রীর বিশেষ-পাঠ্য কলকাতার চলচ্চিত্র শারদীয়াটির সেই সময়, অথবা ভাঁজ করে নিয়েছে যখন শাড়ী, কিংবা আপিসে কলম চালাচ্ছে অবিরাম এমনকি সেই রকম অবস্থাতেও, স্ত্রীর সেই নিশ্চিন্ত নাসিকাধ্বনি সমস্ত শরীর জুড়ে পুলকের দুরন্ত স্রোত বইয়ে দিয়েছে আকরামের। আমারি এ-ধ্বনি. এ আধার আমারি। মনে হয় ভিন্ন এক-জগতে, অপার-রহস্যের এক অমর্তলোকে তার অতনু বিচরণ তনুর সমস্ত আনন্দ পলকে পলকে গুছিয়ে নিয়ে।

কিন্তু তখনও অনেক কিছু জানবার বাকি ছিল আকরামুজ্জামানের। ওর মা এসেছিলেন দেশের বাড়ী থেকে। নতুন বৌকে অনেক স্নেহ-যত্ন করলেন, রান্নাবাড়ি শেখালেন, কিন্তু তিনদিন যেতে না-যেতেই মোরগ-মুরগীগুলো না-জানি কেমন আছে এই অজুহাত তুলে একেবারে পড়িতো মরি করে ছুটলেন দেশে। আকরাম দেখল, এবং দেখলও না। একদিন খেতে বসে কি কি নতুন রান্না শিখলে এই প্রশ্নটা কেমন করে এল আকরাম নিজেও জানে না। অবচেতন থেকে আত্মপ্রকাশ করে থাকবে হঠাৎ। তখন মায়ের প্রসঙ্গে কথা হ'ল। এবং সাধারণতঃ করে না যা আকরাম তাই করল, রসিকতা করল। মা তোমার হাতের রান্না খেলে অত তাড়াতাড়ি যেতেন না। রসিকতাই, কিন্তু স্ত্রী ভিন্ন-অর্থে নিয়েছে। নেয় নি শুধু, খেপে উঠেছে। আকরাম চেষ্টা করেছিল অন্য-একটা রসিকতা দিয়ে এই ব্যর্থ রসিকতার ঝাঁঝটা নেবে কেড়ে। বলেছিল,

রাগ কর কেন, নিজের গুণ কি তুমি নিজে জান? যেমন, ধরো তুমি কি জানো যে ঘুমালে তোমার নাক ডাকে?

আর এগুতে পারে নি। কি, কি বললে বলে শব্দ করে উঠে দাঁড়িয়েছে স্ত্রী, হাত নেড়েছে স্বামীর মুখের সামনে। নাক ডাকা নিয়ে খোটা দিলে? আর তোমার নাক কি করে শুনি, কেরানী সাহেব (এটা যথার্থ নয়, আকরামের প্রমোশন হয়েছে সম্প্রতি)? রাত দুপুরে পাড়া যে মাথায় তোলে তা জানো? মনে হয় যেন ভাঙ্গাগাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না কিছুতেই! সংবাদটি যত না তার চেয়ে বেশী আঘাত করল ভাষা, ভাষা যত না তার চেয়ে বেশী ভঙ্গি, এবং ভঙ্গির চেয়েও বেশী কণ্ঠস্বর। আকরামুজ্জামানের কথা সরেনি। সেদিন নয়, তারপরে অনেকদিন নয়। মনে হয়েছে সে তল পাচ্ছে না।

এই বোধটা, এই কিছুতেই তল পাচ্ছি না বোধটা অবশ্যি কিছু-দিন ধরে গোপনে গোপনে গড়ে উঠছিল আকরামের মনোভঙ্গির মধ্যে। কিন্তু সেটা স্বীকার করতে চায়নি। সাভারে সে যে এক পাখি জমি কিনে রেখেছে নিজস্ব সঞ্চয় থেকে সে-খবর বিয়ের পরের দিনই দিয়েছিল সে নবপরিণীতাকে। পরে দলিলটাও চোখের সামনে নাড়াচাড়া করেছে একদিন, ওই জায়গাটার অপরিসীম সম্ভাবনার উপরও কিছুটা আলোক-পাত করেছে, কিন্তু স্ত্রী'র চোখে আলো-ঝলমল খুশি দূরে থাক ঔৎসুক্যের মৃদু স্ফুলিঙ্গও জ্বলে ওঠেনি। স্ত্রীর সমস্ত আগ্রহ দেখা গেছে জমেছে এসে চলচ্চিত্র সাময়িকীতে। সেই কারণে বিস্তর পত্র-পত্রিকা জোগাড় করে এনেছে আকরাম, কিনেছে কোনটা, কোনটা চেয়ে এনেছে পরিচিতজনের কাছ থেকে। এবং নিজে সে তত্ত্বমূলক ভারি ভারি বই খুলে বসেছে, আড়চোখে খেয়াল রেখেছে ইম্প্রেসড হয় কি না স্ত্রী। না, হয়নি। তবু দমেনি, তবু দমেনি আকরামুজ্জামান।

তবে শঙ্কা হল দমবে সে যখন স্ত্রী'র খালাত ভাই এলেন দু'দিনের জন্য—বেড়াতে। মফস্বলের কলেজে সাহিত্য পড়ান বাংলা, এবং কবিতা, গল্প, নাটক এইসব লেখেন হামেশা। এই সমস্ত আজে-বাজে বস্তু লেখা যে এমনকিছু কঠিন বা মস্ত ব্যাপার নয়, ইচ্ছা করলে সে যে অতিঅনায়াসে পারে করতে এমন কাজ, করে না যে শুধু জাতীয় অপব্যয়ের ভয়াবহ

কুফলের কথা বিবেচনা করে এই ধরনের একটা ভাব আকরাম ফুটিয়ে তুলতে যথেষ্ট পরিশ্রম করল বটে কিন্তু "কোন তন্বী বালিকাকে" এই নামে রবিবারের দৈনিকে ভদ্রলোকের একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা পড়ে বড় একটা ধাক্কা খেল সে, বিশেষ করে স্ত্রী'র উৎসাহ দেখে, স্ত্রীই পড়ালো ওটা, যদিও আকরামের চোখ অকুস্থলে পূর্বেই পড়েছিল।—এই ধরনের লোকদেরকে বিশ্বাস কী! যখন তিনি এলেন দেখা গেল চাদরে, পাদুকায়, কেশে, বেশে সুশোভিত তিনি, বিশেষ করে মুখের ভাষায়। যতটা আশা করা গিয়েছিল তার চেয়ে কম নয় কোন দিক দিয়েই, বরং বেশী-ই।

বেশ কিছুটা দৌড়-ছুট করল আকরাম। লণ্ড্রী থেকে বিছানার চাদর আনল ধুয়ে। বাজারে গেল, মাছ-মাংস, পোলাওয়ের চাল কিনল বেশ উদার হাতে। ফিরে যখন শোনে ঘরে কেরোসিন তেল বাড়ন্ত তখন কোনপ্রকার বিরক্তি প্রকাশ না-করে আবার ছুটল দোকানে, ভরতি টিন টেনে তুলল পাকের ঘরে, নিজের হাতে। স্ত্রীও দেখা গেল আটমাসে যা করেনি তাই করছে, রান্নার কাজে বসেছে আসন-পিঁড়ি হয়ে।

সেই সময়টাতে আকরামের বিশেষ একটা উদ্বেগ ছিল। সাভারের জমির পাশে পাওয়া যাচ্ছে আরো দেড় পাখি। সাত দিনের মধ্যে দু' হাজার টাকা জোগাড় না-করতে পারলে হাতছাড়া হয়ে যাবে চিরতরে। কিন্তু পারবে কি? উদ্বেগাকুল এই গভীর দুশ্চিন্তার কথা স্ত্রীকে জানিয়েছিল, বিছানায়। সাড়া-শব্দ পায়নি। নিঃশব্দে নাক ডাকছিল হয়ত-বা।

কিন্তু এখন সেই বালিকার অন্য-ব্যাপার, ভিন্ন চঞ্চলতা, অস্থির আগ্রহ।

সেটা নাট্যকার খালাত ভাইও লক্ষ্য করলেন। এখন তিনি নাট্যকারই। নাটকের ব্যাপারেই এসেছেন, টেলিভিশনে নাটক হবে তাঁর। শুধু দেখবেন না, যেন নাটকই করছেন আস্ত একটা, ঘরে যতক্ষণ আছেন। আসছেন যখন তখনও, যখন বাইরে যাবেন সেই সময়েতেও। খাবার টেবিলে শ্রম-সংগৃহীত সমারোহের সামনে বসে নাট্যকার বললেন, "কি রে হাসু, তুই যে দেখি একেবারে মৌমাছি মৌমাছি, কোথা যাও

নাচি নাচি।" শুনে হাস্নুর সে কী হাসি, যেন এত-বড় রসিকতা জীবনে শোনে নি। পোলাওয়ের প্রথম গ্রাস গিলেছেন কি গেলেনি, নাট্যকার বলছেন, "আমরা সব কিছুই খাই।" আকরামুজ্জামান ঠিক তল পায় না। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে। "এই দেখুন না", নাট্যকারা এগিয়ে আসেন সাহায্য করতে, "এই দেখুন না আমরা পান খাই, পানি খাই, সিগারেটও খাই।" "সে তো সবাই খায়," হাস্নু'র সাহস বেশী, সে বলে। "জ্বী না, ইংরেজরা খায়না। পানি ওরা ড্রিঙ্ক করে, সিগারেট স্মোক করে, ইট্ করে না। আমরা পান, পানি, সিগারেট সব কিছু চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলি।" "সত্যি ভাইয়া," হাস্নু মনে হল বসে বসেই লাফাচ্ছে, হাত তালি দিয়ে, "সত্যি ভাইয়া, তুমি এত জানো!"

"মুরগীর এখানে কেমন দাম?"—একটা রান শেষ করে ভদ্রলোক আবার রা করেন। "আমাদের ওখানে খুব আক্রা"। সব জানেন তিনি, সমস্ত কিছু নখদর্পণে। এই সুযোগে আকরাম দাম ও মূল্যের পার্থক্যের অনিচ্ছুক প্রসঙ্গটাকে টেনে-হিঁচড়ে আনতে চাইল সামনে। বলল, এই তো আমাদের সমাজ, আমরা সব কিছুরই দাম জানি, কোন-কিছুরই মূল্য জানি না। পাঠ্য-পুস্তকে-পড়া কথা, কিন্তু এখন পড়ে রইল কথাটা টেবিলের ওপর, প্লেট পেয়ালা-গ্লাসের মাঝখানে, কেউ নিল না তুলে। বরং আকরাম দেখল তার স্ত্রী মাংসের পেয়ালা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, কিছুতেই শুনতে চাইছে না নাট্যকারের না না। "কি ভাইয়া, তুমি কি ফিগারের কথা ভাবছ! অত না-ভাবলেও চলবে, প্রত্যেক বছরেই তো শুনি ফার্স্ট ইয়ারের পাঁচজন করে মেয়ে প্রেমে পড়ে তোমার।" শুনে ভাইয়ার সে কী উল্লসিত হাসি। মিষ্টির প্লেট যখন টেনে নিয়েছেন সামনে সেই সময়ে নাট্যকারের মন্তব্য, "মেয়েদেরকে দেখলে সন্দেহ থাকে না সমাজটা বদলেছে।" "কেমন?" আকরামের সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। "দেখুন না, আগের দিনের মেয়েরা কি করত? স্বামীর সেবা, শ্বাশুড়ীর যত্ন, পুত্রকন্যার পরিচর্যা। আর এখন, এখন দেখুন চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখুন, তারা গাড়ী চালাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, ছেলেদের সঙ্গে কনপিট করছে।" জাত অধ্যাপক

যে টের পাওয়া গেল কণ্ঠস্বরে। ওদিকে দেখতে চেয়েও কাউকে দেখতে পেল না আকরাম, নিজের স্ত্রীকে ছাড়া। তবে নিজের কথা মনে পড়ল, পলায়নতৎপর মাতার কথাও। এবং হঠাৎ মনে পড়ল সেই কবিতার কথা, "কোন তন্বী বালিকাকে"। স্ত্রীকে ঠিক বালিকা বলা যায় না বটে তবে নাবালিকা নয়। "কীরে তুইতো কিছুই খেলি না"! বলতে গিয়ে ভদ্রলোক অন্য একটা মস্ত তত্ত্ব খোসা ছাড়িয়ে মূর্তিমান করে তুললেন, "যাই বলুন বাংলা ভাষাটা ভীষণ শ্রেণীসচেতন, এই যে আপনি, তুমি, তুই একাণ্ড অন্য কোন ভাষায় নেই দুনিয়ায়"। কিন্তু আকরাম দুনিয়া দেখছিল না, ছোট খেত দেখছিল। তার মনে হল কেন যেন, খেত-ভরা ফুলও দেখছিল সে—হলুদ রঙএর।

সেই রাতে ভালো ঘুম হল না আকরামের। থেকে থেকে হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় কারা যেন কথা বলছে চুপি চুপি, কারা যেন হাসছে চাপা গলায়। শোনে আর চমকে ওঠে। তাকিয়ে দেখে। না, স্ত্রী-আছে পাশেই শুয়ে, শব্দ আসছে ঠিকই—স্ত্রীর, নাক থেকে।

পরের রাতে নাটক। এক বন্ধুর বাড়িতে ব্যবস্থা করেছিল আকরাম, সপরিবারে নাটক দেখার। স্ত্রী মনে হল বিশেষভাবে সেজেছে। খালাত ভাই লক্ষ্য করলেন, বললেন, কিরে হাস্নু, টেলিভিশনওয়ালারা দেখলে তোকে ছাড়ত না, নায়িকা করত। হাস্নু বলে, খুশি-খুশি গলায়, লজ্জা-লজ্জা স্বরে, "কী যে বল।" এবং যতক্ষণ চলল নাটক আকরামের মনে হল, নাটক, নাট্যকার, স্ত্রী এরা মিলে বৃত্ত গড়েছে একটা, সে তার বাইরে, তার অধিকার নেই প্রবেশের, তাকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে দূরে ফেলে। সে রাতে স্ত্রী'র নাসিকাধ্বনি আরো যেন বেশী করে শুনতে পেল আকরাম, কেননা তার ঘুম হল না এক পলক। সে শাপান্ত করল টেলিভিশনকে।

পরের দিন সকালে আরেক ঘটনা। ভদ্রলোকের একশ'-টাকার নোটটা পাওয়া যাচ্ছে না। নাইত নাইই। "হয়ত অন্য কোথাও পড়ে গেছে, হয়ত আনিইনি ভুল করে।" তিনি বললেন বটে, কিন্তু বোঝা গেল, জোর নেই কথায় এতটুকুও। আর আকরামের নিজের স্ত্রী থেকে থেকে এমন চাউনি দিল যে তার মনে হল সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম তার হয়ে গেছে, জামিন মিলবে না কিছুতেই।

নাট্যকার চলে গেলেন সুটকেশ হাতে। আর সেই সকালে দাঁড়ি কামাতে যেয়ে মুখ কেটে একাকার হল আকরামের, বাস ফেল করল কয়েকবার, এবং আপিসে ওর সাত বছরের কর্মজীবনে যা কখনো হয়নি এবং কখনো হবে বলে মনে করেনি তা-ই হল, ভীষণ ধমক খেল সে বড় অফিসারের কাছে। "কত রকমের খাওয়া আছে সংসারে", নিজেকেই নিজে বলেছিল আকরাম, দুঃখের মধ্যেও।

তারপর খবর এসেছিল পাবনা থেকে। চিঠি নয়, টেলিগ্রাম। দুঃখ প্রকাশ করেছেন নাট্যকার, একশ'-টাকার নোটটা ওঁর ঘরেই ছিল, 'সঞ্চিতা'র মধ্যে, বুকমার্ক হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। অনেক ধন্যবাদ চমৎকার আতিথেয়তার জন্য।

হাসুর হাসি আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু একটা জিনিস আর ফেরেনি। আকরামুজ্জামানের নাক-ডাকানো। ওর স্ত্রীও স্বীকার করেছে সে-কথা।

[আকরামুজ্জামানকে আমি নিজে চিনি না। একদিন দেখেছি আমার হোমিওপ্যাথিক বন্ধুর চেম্বারে। ওর চেহারার সামান্যতাকে ছাড়িয়ে উঠেছিল উজ্জ্বল এক আভা। বন্ধু হেসে বলেছিলেন, সদ্য-বিবাহিত। তারপর আর একদিন দেখা এক দোকানে। দেখি পাল্টে গেছে চেহারা। কেউ বলেনি তার কাহিনী, কিন্তু তবু আমি দেখেছি, লেখা দেখেছি তার ইতিহাস তার মুখের ও চলার ভঙ্গিতে। মর্মন্তুদ নয় অবশ্যই, কিন্তু জীবন্ত, সে যত না তার চেয়ে অধিক জীবন্ত তার কাহিনী।]

গানের ভিতর দিয়ে

ইতিহাসে অনেক পাগলামোর কথা আছে। পাগলে গান করেছে, গানও পাগল করেছে। কিন্তু আমাদের শাহ্‌রিয়ারের ব্যাপারটা ভিন্ন। গানের সঙ্গে তার কখনো কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল এমন কথা বলা খুব শক্ত। বরং গানের ধার সে আদপেই ধারত না, তার ধারাপাতে গানের ধারা পতিত হয়নি বললেই চলে, তার ধ্বনি অন্য-প্রকারের। সে ওঠাতে বিশ্বাস করে, হঠাৎ নয়, লকলকিয়ে নয়, লম্ফ দিয়ে ঝম্পের সাহায্য নেবে তা না, ধীরে ধীরে, টিপে টিপে, উঁচু থেকে উঁচুতে। তার যাত্রা জীবনমরণ। এমন ঐকান্তিকতায় সঙ্গীতের স্থান-সঙ্কুলান করা অসম্ভব কাজ। সেই শাহ্‌রিয়ারকে (এই নামও পৈত্রিক নয়, উদ্ভূত) হঠাৎ একদিন গানে আঘাত করল, একেবারে মমতাবিহীন হস্তে। মনে হল সে পাগল হয়ে যাবে।

সেদিনটা যেকোন দিন নয়, তার বিয়ের দিন। বর সে, গাড়ীতে উঠবে, পা দিয়েছে সামনে, রুমাল ধরেছে মুখে, ঠিক সেই সময়ে—। ঠিক সেই সময়ে কোথা থেকে কেমন করে জানে না শাহ্‌রিয়ার, আয়ে-গা, আয়েগা'র টানা টানা শব্দ। এক লহমায় বুঝে নিল সে অন্য কোথাও নয়, বরযাত্রার আয়োজনের ভেতর থেকেই বেরিয়ে এসেছে এই উন্মাদ—এই গান। শুনে কোন দিন যা করেনি শাহ্‌রিয়ার তাই করল, আত্মবিস্মৃত হল। সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ এবং অত্যন্ত অনিয়ম-তান্ত্রিক একটা কাজ করে বসল সে। ছুটে গিয়ে নিজ হাতে টেনে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে মাইক্রোফোন।

এদিকে সঙ্গীতআলেখ্যের এই পাদটীকা সংযোজন এই কাজটা করেছিল ওর বড় বোনের জামাই। মফস্বলের ছোট শহরে ছোট ব্যবসায় করেন ভদ্রলোক। স্ত্রী'র প্ররোচনায় টাকা নিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে করে, সাধ মিটিয়ে সাধ্যমত আমোদ করবেন শ্যালকের বিবাহে। নিজস্ব উগ্তম, বুদ্ধি ও অর্থ একত্র করে ব্যবস্থা করেছিল গান-বাজনার। সেই পক্ষও কম ক্ষেপলেন না, আত্মবিস্মৃত তাঁরাও হলেন, এবং প্রকাশেও কার্পণ্য করলেন না কোন প্রকারের। কিন্তু শাহ্‌রিয়ার উন্নতি-পথের পথিক, তার গাড়ী বসে থাকল না, ছুটল অল্প পরেই। পৌঁছাতে কোন বিলম্ব হয়েছিল এমন কথা কেউ বলেনি।

তবে বোনের পক্ষ যোগ দেয় নি। সেই রাত্রেই শহর পরিত্যাগ করেছেন তাঁরা। শোনা যায় কাঁদতে কাঁদতে। কাঁদতে কাঁদতেই চিঠি লেখেছেন পরে, গানের ব্যাপারে ভাইয়ের অবিশ্বাস্য বর্বরতার কথা বলে। শাহ্‌রিয়ারের কাছে নয়, ওর স্ত্রী'র কাছে। (সেই পক্ষ থেকেই শোনা এই ইতিহাস। ওর শ্যালক বাংলা বইয়ের ভক্ত, আমাকে ধার দেয় কখনো কখনো, সেই সুবাদে এসেছে কথা দুলাভাইয়ের)।

শাহ্‌রিয়ারের স্ত্রী পড়তে দিয়েছিল চিঠি, দিয়ে হেসেছিল সেই হাসি যা শুধু নবপরিণীতারাই হাসতে পারে। (এখানে এবং অন্যত্র কল্পনাটুকু বেশীর ভাগ আমার। কাঠামোটি ওর শ্যালকের, শ্যালক যে একেবারে মুরব্বিহন্তা তা নয়।) সেই হাসির বেষ্টনীর মধ্যে শাহ্‌রিয়ারের মনে হচ্ছে খুব কাছাকাছি এসেছে স্ত্রী'র। অন্তরের কাছে—একেবারে। তারা এক, অভিন্ন—রুচিতে, শিক্ষায়, গানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে। স্বপ্নালোক স্বপ্নলোক তাদের। মিলন দোঁহে মিষ্টি হাসিতে।

কিছু দিনের মধ্যেই কিন্তু দেখা গেল সত্যিকারের স্বপ্নলোক সত্যি সত্যি আক্রান্ত হয়েছে। ঐ গানের দ্বারাই। আশা ছিল অচিরাৎ থেমে যাবে। কিন্তু থামা দূরে থাক, অন্য শব্দ যত কমে আসছে, নিভে আসছে, নিস্তেজ হয়ে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে তত দেখা গেল প্রবল দ্বিগ্বিজয়ী ও মর্মভেদী হয়ে উঠছে শব্দ। গান বাজছে মাইক্রোফোনে। যে-পাড়ায় বাস শাহ্‌রিয়ারদের সেখানে কারো মাইক বাজাবার কথা নয়—বিয়েতে কি উৎসবে বা শবেবরাতে সেখানে এমনকি পটকাও অত্যন্ত

অপ্রত্যাশিত, সেখানে প্রধান ধ্বনি চলতি গাড়ির তাৎক্ষণিক শব্দ। সেই ভদ্রবেশী নম্র পাড়ার একী কাণ্ড দক্ষযজ্ঞ। "শোন বন্ধু শোন।" শাহ্‌রিয়ার অনেকবার শুনেছে, আর আশা করেছে এই বুঝি হল শেষ, এবার বুঝি ঘুম নামবে গ্রামোফোনে। শাহ্‌রিয়ারের মনে হল, ওর স্ত্রী হাসছে। মিটমিট। নিতান্ত অসহায় অবস্থা দেখে। গানওয়ালাদের যেন আর কোন উদ্দেশ্য নেই, শাহ্‌রিয়ারকে যন্ত্রণা দেওয়া ছাড়া।

পুরোপুরি সকাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল নিদ্রাহীন শাহ্‌রিয়ারের পক্ষে। স্ত্রী মনে হয় সারারাত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হেসেছে। গান তো অসহ্যই, কিন্তু তারো চেয়ে অসহ্য মনে হচ্ছিল স্ত্রী'র ঐ নিঃশব্দ ও অদৃশ্য হাসি। সার্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে প্রায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল শাহ্‌রিয়ার, শব্দের অভিমুখে। ভালো করে যে বাধা দেবে তেমন সুযোগই পেল না ওর অর্ধঘুমন্ত স্ত্রী।

কপালে ব্যাণ্ডেজ-বাধা অবস্থায় না-হলেও মলিন মুখে ছত্রভঙ্গ চেহারায় ফিরল শাহ্‌রিয়ার। গান তো থামেইনি বরং সেই কাটা রেকর্ডটা শোন শোন শোন করে ঘন ঘন হুঙ্কার দিতে থাকল সহিংস্র। স্ত্রী মনে হল হাসছে। সেটা মনের ভুলও হতে পারে, কিন্তু সত্য-মিথ্যা নিরূপণ করবার মত মনের অবস্থা ছিল না। পাড়ার ছোকরারা ফুটবলে জিতেছে সেই ফূর্তিতে মাইক-বাজানো। চাঁদা দেওয়া দূরে থাক্, শাহ্‌রিয়ার গেছে উৎসবে বাধা সৃষ্টি করতে ওটা জেনে ছোকরাগুলো উষ্ণ হয়ে পড়েছিল সম্ভবত। যা তা বলেছে, ওর যুবতী স্ত্রী'র নিরাপত্তার প্রসঙ্গও টেনে এনে থাকবে। সেটা শাহ্‌রিয়ার বলেনি, বলবার কথাও নয়। স্ত্রী জেনেছে পাশের বাসার মেয়ের কাছ থেকে, মেয়ের ভাই উৎসবে ছিল।

"তুমি এত গোল করতে গেলে কেন খামোখা?" খুব নরম গলায় বলেছে স্ত্রী। নরম মেয়ে আতিয়া। এমন কিছু আহামরি নয় রূপে। কিন্তু শিক্ষিতা, নম্রস্বভাব। ওর বাবা'র অনেক সুতো আছে হাতে, সেই সুতো ধরে অনেক জায়গায় টান দিতে পারেন ইচ্ছা করলে, দিয়ে থাকেন প্রায়শঃ। সব জেনে শুনেই বিয়ে করেছে শাহ্‌রিয়ার।

কিন্তু এটা জানত না। গানের ব্যাপারটা জানা ছিল না। আতিয়ার নাকি ইয়ে ছিল কিছুটা এক গায়কভাইয়ার সঙ্গে। তপস্যা ও প্রতিভার

বলে জীবনে অনেক প্রায়-অসম্ভব কাজ সম্ভব করেছে শাহ্‌রিয়ার, এমন রেকর্ড অবশ্যই আছে। গমন করেছে দুর্গম স্থানে, উন্মুক্ত করেছে অর্গলবদ্ধ পথ, জয় করেছে দুর্ধর্ষ হৃদয়—কিন্তু এই গান গাওয়া শেখা, এ বড় বেশী কঠিন ঠেকল তার কাছে। কিন্তু সে সম্মান করল স্ত্রীর সঙ্গীতপিপাসার, ঠেলাগাড়িতে করে আস্ত এক পিয়ানো এনে হাজির করল বাসায়। সাহেব পাড়াতে কেনা, সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড দামে, কিন্তু একেবারে নতুন বলতে গেলে। স্ত্রীর দেখা গেল খুব আহ্লাদ। দিনে-রাতে যখন তখন যেমন-তেমন করে শুনছে গান। শোবার ঘরে, বিছানার গা-ঘেষে বিছিয়েছে পিয়ানো, হাত বাড়ালেই যেন পায়, যেন অনায়াসে চলে যেতে পারে রেডিও সিলোনের অলৌকিক স্বর্গে।

এই স্বর্গযাপনের মধ্যেই একদিন মিলিটারি নামল দেশে। মার্চে, একাত্তুর সালে। তখন খুব ভয় পেল শাহ্‌রিয়ার। বিশেষ করে রেডিওগ্রামের কারণে। স্ত্রী'র উৎসাহে ভূরিভূরি জয় বাংলা-মার্কা রেকর্ড কিনেছে। তার উপর বাসা তার সদর রাস্তার প্রায় উপরে। যে কোন সময় ঢুকতে পারে মিলিটারি। স্ত্রী'কে বিশ্বাস কি, যদি সে স্বাধীন বাংলা বেতার শোনে। আর সেই মগ্নাবস্থাতেই যদি আসে পাঞ্জাবী?

শোনে, স্ত্রী স্বাধীন বাংলা শোনে। নিজের কানেই শুনতে শুনেছে শাহ্‌রিয়ার। মৃদু নিষেধ করেছে প্রথমে, পরে, নিরুপায় হয়ে, ধমকে দিল প্রবল স্বরে। একবার কি করল অত দামী রেডিওগ্রাম সেটাকে বিকল করে দিল নিজ হাতে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, পরের দিনই শোনে চলছে যন্ত্র, বাজছে যথারীতি। ঐ যে শ্যালক, গল্প-পড়ুয়া, সে-ই সারিয়ে দিয়েছে বন্ধুদের ডেকে এনে। তারপরে শোবার ঘরে পাহারা দিল শাহ্‌রিয়ার, আগলে বসে রইল রেডিওগ্রাম। কিন্তু কত পারা যায়, বাথরুমে যাওয়া আছে, আপিস আছে, আছে খাওয়া-দাওয়া। ফাঁক পেলেই সন্দেহ ওর, হাত দেবে স্ত্রী, শুনবে নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ সব খবর। ইতিমধ্যে ব্যাপার আরো ভেজাল হয়ে উঠল শ্যালকের কারণে। শোনা গেল সেই শ্রীমান যোগ দিয়েছে মুক্তিবাহিনীতে। অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে অবিশ্বাস করল শাহ্‌রিয়ার খবরটাকে। কিন্তু মনে হল খবর সত্য, হয়ত পাঞ্জাবীরাও জানে।

একদিন গভীর রাতে ওর স্ত্রী জেগে উঠেছে। শোনে ঘরের মধ্যে টানা-হেঁচড়ার শব্দ। তাহলে কি সত্যি সত্যি বাঘ পড়ল পালে? মিলিটারি

ঢুকল ঘরে? আতঙ্কে যখন শব্দ সরছে না সেই সময় উদ্ধার করল স্বামী, বলল, রেডিওগ্রামটা টেনে ড্রয়িং রুমে নিচ্ছে সে। স্ত্রীর মনে হয়েছিল দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে গেছে স্বামী। দ্বিতীয়বার ভয় পেল বেচারা। ঝাপটে ধরেছিল। কি? কি হয়েছে তোমার? মাথা ঠিক আছে তো?

সুস্থ, সুস্থের চেয়েও সুস্থ আছে শাহ্‌রিয়ার। খোদা না-করুন সত্যি সত্যি ঢোকে যদি মিলিটারি তবে শোবার ঘরে রেডিওগ্রাম দেখলে কি ভাববে? যা ভাববার তাই ভাববে। চীৎকার করে বলবে, তুম শা— লোগ বাদমাস হো, ছিপ-ছিপাকে স্বাধীন বাংলা শোনতে হো। বলে আর কাল বিলম্ব করবে না, গুলি ছুঁড়বে অব্যর্থ। সেই দুশ্চিন্তায় রাত দুপুরে মানুষ-সমান লম্বা রেডিওগ্রামটা ধরে টানাটানি করছে একলা হাতে। ড্রয়িং রুম দু'ঘর পার হয়ে, সেখানে নিয়েও স্বস্তি নেই, কোন জায়গাটা অসন্দিগ্ধ সেটা খুঁজছে, মনঃপুত হচ্ছে না, সরাচ্ছে, ঠেলছে, দিচ্ছে ধাক্কা।

কিন্তু নিরাপদ জায়গা সত্যি খুঁজে পায় নি শাহ্‌রিয়ার। মিলিটারি ক্যাম্প করেছিল বাসার সামনেই। খুব ফূর্তি তাদের। চুটিয়ে গান শোনে, দিন নেই রাত নেই। শাহ্‌রিয়ারও শোনে, দিব্যি শুনতে পায়। এই ক্যাম্পেরই লোকেরা একদিন ঢুকল বাসায়। এবং রেডিওগ্রামটা হাতে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে গেল ক্যাম্পে। রেকর্ডও নিল যে-কয়টা ছিল, উর্দু ও পাঞ্জাবী গান যা পাওয়া যায় কিনে এনেছিল শাহ্‌রিয়ার, বাংলা গান পুড়িয়ে ছাই পর্যন্ত পানিতে মিলিয়ে দিয়েছে। ফ্লাস টেনে। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে কোথাও কোনটা লুকানো আছে কী না।

মনে হল আপদ গেছে। স্বাধীন বাংলা বেতারের আতঙ্কটাতো গেল। কিন্তু স্ত্রী'র ব্যাপার অন্য। আপিস-ফেরতা ঘরে এসেছে একদিন, দেখে স্ত্রী কানে লাগিয়ে বসে আছে ছোট্ট একটা ট্র্যাঞ্জিষ্টার, যেন গয়না একটা কানের। ক্রোধে, আতঙ্কে, অভিমানে কিছু বলতে পারেনি শাহ্‌রিয়ার, দুপ্‌ দাপ্‌ করে বেরিয়ে গেছে ঘর ছেড়ে। কিন্তু বেশী দূর যাওয়া হয় নি, সেদিন আবার কার্ফু ছিল পাঁচটাতেই। ফিরে এসে দেখে তখনো কর্ণলগ্ন হয়ে আছে সেই ক্ষুদ্রাকৃতি ভীষণ উৎপাত। মগ্ন হয়ে মনে হয় গানই শুনছে নিষিদ্ধ। তখন, এই দ্বিতীয় বার, আত্মবিস্মৃত হল শাহ্‌রিয়ার। ছিনিয়ে নিল

ট্র্যাঞ্জিষ্টার—অনেকটা মিলিটারির মতই, এবং তাদেরই মত করে পায়ের নীচে ফেলে গুতিয়ে দিয়েছে চুরমার করে। পরের দিন সকালে কার্ফু ওঠা পর্যন্ত যা অপেক্ষা, ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী চলে গেছে বাপের বাড়ী। শাহ্‌রিয়ার ভাবল, জীবন তো বাঁচল, পরে দেখা যাবে বাকিটা।

স্ত্রী অবশ্যি ফেরত আসেনি। পাঞ্জাবীরা এসেছে মাঝে মাঝে। গান ও স্ত্রী'র উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই যেন বিশেষ ভালো ব্যবহার করেছে শাহ্‌রিয়ার তাদের সঙ্গে।

তারপর আচমকা দেশ স্বাধীন হয়ে গেল একদিন। প্রায় প্রবৃত্তি-পরিচালিত হয়েই বুঝি প্রথম যে কাজটি করেছিল শাহ্‌রিয়ার সে-হল দৌড়ে যাওয়া মিলিটারি ক্যাম্পে। যেয়ে দেখে বিলম্ব হয়ে গেছে সামান্য, পাড়ার ছোকরারা হাতে ধরাধরি করে বার করে নিয়ে যাচ্ছে ওর সেই রেডিওগ্রাম, যেন লাশ একটা। নিশ্চল শাহ্‌রিয়ার, দেখলই শুধু। ছোকরাদের একজন, সেই ক্লাবওয়ালা ওরা, তের্ছা হেসে বলল, "আপনার বিচার আছে, পাঞ্জাবীদের সঙ্গে কি কি করেছেন সব হিসাব আছে আমাদের কাছে।"

তা কিছু বড় অঙ্কেরই চাঁদা দিতে হয়েছিল শাহ্‌রিয়ারকে। ছোকরাদের ক্লাবে। বাসাতে ক্যাম্প করতেও দিয়েছিল নিজের থেকে। গরুও জবাই দিয়েছিল একটা।

রেডিওগ্রাম অবশ্যি ফেরত আসেনি। তবে স্ত্রী এসেছে। নতুন বাড়ীও হয়েছে শাহ্‌রিয়ারের। কলকাতা গিয়েছিল স্বাধীন হওয়ার ছ' মাসের মধ্যে। স্ত্রী'কে ঢালাও পারমিট দিয়েছে, যত দরকার রেকর্ড কেন। তা কিনেছে, বাংলা-হিন্দী-ইংরেজী মিলিয়ে শ' পাঁচেক হবে। ইংলণ্ডে গিয়েছিল সম্প্রতি ব্যবসা উপলক্ষে। ডজন পাঁচেক রেকর্ড এনেছে সঙ্গে লং প্লেয়িং, পপ্ গানের। আজকাল চালু নাকি এগুলো। আর, ভালো কথা, রেডিওগ্রামও অর্ডার দিয়ে এসেছে একটা। জাহাজ আসার অপেক্ষা।

গানের সঙ্গে সন্ধি করেছে শাহ্‌রিয়ার। গুন্ গুন্ করে গানও গায় আজকাল। —ওর শ্যালক আমাকে জানিয়েছে, মুচ্‌কি হেসে।

সিলেটে

সিলেটে গেলে আমার খুব ভালো লাগে লণ্ডন দেখতে। সেখানে কাপড় ধোয়ার লণ্ড্রী, ছবি তোলার দোকান, উড়োজাহাজ কম্পানীর এজেণ্ট সম্ভব-অসম্ভব নানাস্থানে নানাভাবে দেখি লণ্ডনের ব্যস্ত কারচুপি। লণ্ডন আছে নিঃশব্দ অনিবার্য উপস্থিতিতে। এমনও শুনেছি ঐ জেলার চাষী-ভাইদের মেমসাহেব বউ'রা রোজ দুপুরে মোজা-পায়ে টিফিন-কেরিয়ার করে ভাত নিয়ে যায় ধানের ক্ষেতে, স্বামীরা খাবে। চোখে দেখিনি, তবে কানে শুনে অত্যন্ত আনন্দ হয়েছে। সাবাস দিয়েছি চাষী-ভাইদের।

কিন্তু লণ্ডন নয়, নকল বা খাঁটি কোন মেমসাহেবও নয়, আমার বিষয় নগণ্য এক মোকাদ্দেস মিয়া।

মোকাদ্দেস মিয়া তার নাম কিনা আমি মোটেই জানি না। কিন্তু হতে দোষ কি, নাহলেই বা ক্ষতি কি?

আমি গিয়েছিলাম এয়ারপোর্টে, একজনকে রিসিভ করতে। গিয়ে দেখি ব্যাপার অন্যপ্রকার। ছোটখাট হাট বসেছে। অসংলগ্ন, অনির্দেশ্য। কোন কেন্দ্র নেই বৃত্তের, সমস্তটাই পরিধি। এক সঙ্গে এসেছে, নাকি আলাদা আলাদা? যে ভাবেই আসুক একত্র হয়ে যেতে পারেনি, জনসভা হয়ে ওঠেনি, মিছিলও নয়। যেন খেয়ালী কেউ বড়-একটা ভিড়কে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে, এখানে-সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে তার অংশ। অন্য যাঁরা এসেছেন বন্দরে তাঁরা বুঝেছেন ব্যাপার কী, তাঁদের চোখে কোন কৌতূহল নেই। বরং বুঝেছি-বুঝেছি ধরনের মৃদু-মন্দ

হাওয়া দোল খাচ্ছে মুখে মুখে। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ নবাগন্তুক, আমি মূর্খের মত তাকিয়ে আছি শুধু, এদিকে দেখছি, ওদিকে দেখছি।

প্লেন যখন নামল এসে সমস্তটা এয়ারপোর্ট তার জমাট-স্তব্ধতা ভেঙে হাই তুলে জেগে উঠল। শুধু ঐ জনতার ভেতর দেখি তেমন-কোন চাঞ্চল্য নেই। ছুটে গেল না কেউ, জমাট বাঁধল না ভিড়, লাফ দিল না কোন যুবক, কোন অত্যুৎসাহী জিন্দাবাদও নেই। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল কোন নেতা আসছেন না রাজনীতির। তবে কে আসছেন? কার জন্য এই আয়োজন? মেয়ে-পুরুষ যুবক-বৃদ্ধের এই একত্র সমাগম?

যে-ভদ্রলোককে নিতে এসেছিলাম দেখি তিনিও আসেননি। কিন্তু অন্য-একজন এসেছেন। প্রায়-পরিচিত। ব্যাগ ঝুলিয়ে ফট্‌ফট্‌ করে নেমে আসছেন।

"কী দেখছেন?" তিনি দেখেছেন আমার দেখা। "ওঃ! বুঝেছি।" বুঝে নিলেন। সেই বুঝেছি-বুঝেছি হাওয়া তাঁরও মুখে। কিন্তু আমি বুঝিনি। আমি বুঝতে চেষ্টা করছি। বুঝবার জন্য ঘোরাঘুরি করছি।

এতক্ষণে অদৃশ্য-একটা শক্তি যেন প্রবেশ করেছে ভিড়ে। যেন একটা কেন্দ্র পেয়েছে কোথাও। কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি। আমি পারি না সহজে সচরাচর। আমি দূরে দূরে চলে যাই, কাছের জিনিস অনাবিষ্কৃত থেকে যায় অধিকাংশ সময়ে। অলস বলেই বোধ করি। "কি, দেখতে পেয়েছেন?" না, আমি দেখতে পাইনি তখনো। আমি জনতা দেখছিলাম, পরিধিটাই চোখে পড়ছিল শুধু, কেন্দ্র কোথায় অবগুণ্ঠিত। "ঐ দেখুন।" দেখলাম কাঁদছে কেউ কেউ, সান্ত্বনা দিচ্ছে কেউবা। আর একজন যাচ্ছে এগিয়ে উড়োজাহাজের দিকে।

সে-ই মোকাদ্দেস মিয়া। সহজেই চোখে পড়ে। অনেকের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠবার মত। প্যাণ্ট পরেছে ঢিলা, উপরে ঢোলা কোট, তার উপরে ঝোলা-এক ওভারকোট।

তার জন্যই আয়োজন। গ্রাম ভেঙে এসেছে বিদায় দিতে। পড়শি এসেছে, এসেছে প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বেরাদর বাকি নেই কেউ। মোকাদ্দেস যাবে না, কিছুতেই যাবে না, যেতে চায় না। কাঁদছে মা মেয়েদের মত সশব্দে, কিন্তু ওর বেমানান পোশাকে, অভিমন্থর পদক্ষেপে,

ফিরে ফিরে তাকানোর ভঙ্গিতে কান্না ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে বারিধারার মত। আতঙ্কিত প্রাণীকে কারা যেন নিয়ে যাচ্ছে উৎসর্গ করবে।

সিঁড়ির কাছে এসে মোকাদ্দেস দেখি হাত চেপে ধরেছে দু'তিনজনের। যাবে না, উঠবে না উঁচুতে, ঐ সিঁড়ি বেয়ে। কী বলছে শোনা যাচ্ছে না। চেহারার বিষণ্ণতাটা শুধু দেখা যাচ্ছে এখান থেকেও। ঐ দু'তিনজন মনে হল অভিজ্ঞ ব্যক্তি। হাত বুলাচ্ছে মাথায়। প্রবোধ দিচ্ছে বোধ হয়, নিশ্চয় দিচ্ছে সাহস। এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে এক পাশে। ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল সে বাবা মোকাদ্দেসের। যে-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার কথা বইতে পড়েছি, জীবন দেখলাম বইয়ের চেয়ে জীবন্ত।

আমি ভুলে গেছি কেন এসেছিলাম এয়ারপোর্টে। ওর গায়ের কোটের মতই বেমানান যে মোকাদ্দেস মিয়া এই এয়ারপোর্টে, সে দেখি আমাকে গ্রাস করে নিয়েছে। মোকাদ্দেস মিয়া উঠছে, জোরে, যেন লাফিয়ে গেল কয়েক ধাপ। তারপর যখন প্রবেশ করবে হা-করা গহ্বরে তখন মনে হল থেমেছে, শুধু থামেনি, যেন নামছে, যেন নেমে ছুটবে, আতঙ্কিত পায়ে দৌড় দেবে প্রচণ্ড। আর তখনি মনে হল নীচের লোকেরা ওর স্বজন নয়, মিত্র নয়, বান্ধব নয়, যেন শত্রু ওর, যেন গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছে, বলি দেবে কোন যূপকাষ্ঠে।

কিন্তু ইতিমধ্যে আমি নিজেই গ্রেফতার হয়ে গেছি। সেই পরিচিত ভদ্রলোক আমাকে টানছেন, নিয়ে যাবেন শহরে তাঁর জন্য আগত গাড়ীতে।

দেখি প্লেন উড়েছে। দেখলাম নীচের লোকগুলোকে। এখনি আবার মারা যাবে এই এয়ারপোর্ট। এখনি হারিয়ে যাবে এই লোক-গুলো। উপমার বদল ঘটেছে আমার মনে। যেন প্রকাণ্ড শকুন একটা বাচ্চাকে ছিনিয়ে গেল ঠোঁটে ঝুলিয়ে।

প্লেনের ভেতরে মোকাদ্দেস মিয়াকে দেখতে পাচ্ছি। উঠে দাঁড়াতে চাচ্ছে। নামবে, নেমে যাবে। থামাও, থামাও তোমরা। ষ্টুয়ার্ড এসে ধমকে দিচ্ছে। প্লেন-ভরা ভদ্রলোকদের মুখে সেই পরিচিত বুঝেছি-বুঝেছি হাসি। হয়ত আতঙ্কিত হচ্ছেন কেউ কেউ। চলল, ঐ দেখ চলল আমাদের জাতীয় বিপর্যয়। লণ্ডন যাবে, গিয়ে ডুবন্ত সম্মানকে আরো দেবে অনেকটা দাবিয়ে। চুনকালি পড়বে জাতির

অনুজ্জ্বল মুখে, উপায় থাকবে না আমাদের মুখ দেখাবার। এ সব লোক না জন্মালেই ভালো ছিল।

গাড়িতে বসে সেই আতঙ্কের চলন্ত ছবি তুলে ধরছিলেন সঙ্গের ভদ্রলোক। ভাবুন দেখি, কি সব মাল পাঠাচ্ছি আমরা বিদেশে। কী করবে, কী বলবে এরা লণ্ডনে! বাংলাইতো বলতে পারে না ভালো করে। ভুক্তভোগী তিনি, অনেকবার গেছেন বিদেশে, বিদেশী কোম্পানীর দেশী সাহেব তিনি, যেতে হয় বছরে দু'য়েকবার। মুখ দেখাতে বাস্তবিক বিঘ্ন ঘটেছে তাঁর। ফর্সা মুখ ম্লান হয়েছে লজ্জায়। মনে হল অতি বিপন্ন জাতীয়তাবাদ বসে আছে আমার পাশে, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হৃদয়ে, মোকাদ্দেস মিয়ার বাবার চেয়েও উদ্বিগ্ন, মোকাদ্দেস মিয়ার বাবা উদ্বিগ্ন নিশ্চয়ই, কিন্তু আশান্বিতও বটে। যদি মোকাদ্দেস নেমে আসত সত্যি সত্যি, দৌড় দিত চোঁচাঁ, তবে সব চেয়ে বেশী আতঙ্কিত যে হত সে অন্য কেউ নয়, মোকাদ্দেস মিয়ার বৃদ্ধ পিতা, যে কাঁদছে এখন, যাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে অভিজ্ঞ পাঁচজন। তখন কেঁদে উঠতো আরো বেশী হতাশ-কণ্ঠে, সান্ত্বনা দেবে তেমন ক্ষমতা থাকত না কারোই।

কোথায় চলেছে মোকাদ্দেস? কোন দেশে, কার ঠিকানায়? সে জানে না। তার মোহ নেই। জানা আছে শীত সেখানে খাপ পেতে আছে কঠিন অনাত্মীয়ের মত। সেখানে লোকে কথা বলে শত্রুর ভাষায়। নাক সিঁটকায়। আঁধারে-অন্ধকারে লাগিয়েও দেয় দু'য়েক ঘা। সাদার মধ্যে কালো তারা, মোকাদ্দেস মিয়ারা, যেন কয়লা-খনির কৃষ্ণ শ্রমিক, ভাগ্যের কয়লা ভাঙছে, পাউণ্ড বের করে আনবে কয়লা নিঙড়ে। যে পাউণ্ডে হাসি ফোটে বাপ ভাইয়ের মুখে, ভাত জোটে, জমি আসে। মোকাদ্দেস মিয়া সব জানে। বাপের মুখ দেখেছে, দেখেছে বোনের মুখ, দেখেছে সেই মেয়েটির যার সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়ে আছে পাকাপাকি। ঐটুকুই পুঁজি। বাহুবল নয়, প্রসিদ্ধ সহ্য-ক্ষমতা নয়, রাতের শিফটে খাটার যোগ্যতা নয়, ইংরেজরা যে-কাজ করে না, করতে চায় না সে-সব কাজ করতে সোৎসাহ আগ্রহও নয়, পুঁজি ঐটা, ঐ বাপের মুখ, বোনের মুখ, মুখ প্রিয়তমার। মোকাদ্দেস মিয়ার জোর ঐখানে। ঐটুকু পুঁজি নিয়ে লম্বা ঢোলা ওভারকোট

গাঁয়ে বিজন-বিভুঁয়ে চলেছে বাচ্চা ছেলে মোকাদ্দেস। কোন মোহ নেই, কোন উষ্ণতা নেই। যেন আসামী যাচ্ছে জেলখানায়, প্রিয়জনের মুক্তির খোঁজে।

আলী আফজাল সাহেব, আমার সহযাত্রী আফজাল সাহেব, চিত্র দিচ্ছিলেন মোকাদ্দেস মিয়াদের জীবনযাত্রার। হাইজিন ও স্যানিটেশনের সামান্যতম জ্ঞান নেই। যে-পাড়ায় বসতি করে পেঁয়াজ আর রসুনের গন্ধে ইংরেজদের তাড়িয়ে ছাড়ে। দাগ পড়ে যায় বাড়ি-ঘরের ঝরঝর করে। মানুষ নয়, পশু, থাকে পশুর মত।

জাতির গৌরব আলী আফজাল সাহেবদের ব্যাপার ভিন্ন। তাঁরা বিদেশে যান দেশী মেমদের শপিং লিষ্ট হাতে নিয়ে। জিনিস কেনেন। খোঁজেন কোথায় পাউণ্ড পাওয়া যায়। মোকাদ্দেস মিয়াদের খোঁজ করতে হয় কখনো কখনো, সে-কাজটা করেন প্রাত্যহিক ব্যক্তিগত কর্ম-গুলোর মত, আনন্দ নেই, কিন্তু করার পরে সুখ আছে।

বিদায়ের দৃশ্য আমি অনেক দেখেছি। আগেও দেখেছি, পরেও দেখেছি। ফুল দেখেছি, মালা দেখেছি, চুম্বন, ক্রন্দন, জয়ধ্বনি—সমস্ত কিছু। হাত দেখানো, ওড়ানো রুমাল, তাকানো পেছনে—থেকে থেকে, বারে বারে।

কিন্তু সিলেটের সেই গৌরবহীন বিদায় আর কখনো পড়েনি চোখে, আশা ও উদ্বেগকে একত্র-করা গরীব মানুষের সেই আকাশযাত্রা। পাকিস্তান ভ্রমণ এনেছিল, বাংলাদেশও এনেছে, আলী আফজাল সাহেবেরা বাড়বেন, মাশাল্লাহ্, সংখ্যায়, নইলে স্বাধীনতা কেন আনলাম আমরা, নইলে মোকাদ্দেস মিয়ার ভাইরা কেন লড়ল, মোকাদ্দেস মিয়ারা কেন না-খেয়ে পাউণ্ড দিল চাঁদা। শপিং লিষ্ট লম্বা হবে হোক, আমরা জয়ধ্বনি দেব। বিজ্ঞানের পত্রিকায় সেদিন পড়লাম কিছু-কম পণ্ডিত অতি-বড় পণ্ডিতের প্রশংসা করছেন তাঁর এই উদ্ধৃতি দিয়ে যে কিছু-কম পণ্ডিত যে আটবছর বিদেশে ছিলেন দেশী বউ নিয়ে, একেবারে স্বদেশী বউ নিয়ে, সেই কথাটা বেশী-পণ্ডিত উল্লেখ করেছেন প্রফুল্ল-কণ্ঠে, করে চাপড়ে দিয়েছেন পিঠ। সাবাস! সাবাস বটে! সেই রকম প্রশংসার কাজ আরো-বেশী করবার সুযোগ

পাবেন ছোট-বড় পণ্ডিতেরা, আমরা সুযোগ পাব জয়ধ্বনি দেবার। পত্রিকা আছে, সুযোগ আছে তাঁদের, লিখবার।

কিন্তু মোকাদ্দেস মিয়া? বিলাতকে মোকাদ্দেস বিলাত হিসাবেই দেখবে, স্বর্গ ভাববে না কখনো, মেম সাহেবদের মেয়ে মানুষ বলেই চিনবে, মস্ত উঁচু প্রতিমা জ্ঞান করবে না কোন দিন।

কিন্তু মোকাদ্দেস মিয়া, তুমি তো একা নও ভাই, তোমার গ্রাম-ভরা মানুষ আছে, বাপ আছে, বোন আছে, আছে প্রতীক্ষমাণা প্রিয়তমা, তোমার ভয় কি? তুমি তো আলী আফজাল সাহেবদের ডরাও না, যেমন তাঁরা ডরান তোমাকে, অত বড় বড় সব মানুষ হওয়া সত্ত্বেও। তুমি লড়বে অন্য শক্রর সঙ্গে, তুমি দীর্ঘজীবী হও।—আমি নীরবে বলেছি এই কথা।